

www.banglabookpdf.blogspot.com

সেরা
ভূতের
গল্প

www.banglabookpdf.blogspot.com



www.banglabookpdf.blogspot.com

সূচীপত্র

ঘাটবাবু	৯	সুন্দীল গঙ্গোপাধ্যায়
মানুষ নয় অস্ত্র কিছু	১৭	শেখর চৌধুরী
খাঁচা ছাড়া আত্মা	৩৪	অসীম রায়
জ্ঞানাব মজিল	৪১	হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
শতাব্দীর ওপার থেকে	৫৬	সমরেশ বসু
বীণা	৭৬	সমীরকুমার চক্রবর্তী
সেই দুর্গন্ধ	৮২	বাসুদেব ভট্টাচার্য
কাটা হাত	৯৪	এহসান চৌধুরী
অভিশপ্ত শৃঙ্খল	১০২	তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

এই সিরিজের অন্যান্য বই :

ভৌতিক গল্প ১

ভৌতিক গল্প ২

ভৌতিক গল্প ৩

Join Us On Facebook

www.facebook.com/banglabookpdf

ঘাটবাবু

www.banglabookpdf.blogspot.com

রাত ক'টা বাজে তার ঠিক নেই। অনেককণ ধরেই একটানা বৃষ্টি পড়ছে। বমবমে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে নেশা লেগে যায়।

বাসু হালদারের ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছে বারবার। একটা অশুভি হচ্ছে কি রকম। দরজার বাইরে ছুটো কুকুর এসে গুটি গুটি হয়ে শুয়ে কুই কুই শব্দ করছে। বাসু হালদার চেঁচিয়ে উঠলো, 'এই যা ! যা !'

যদিও সে ভালো করেই জানে, কুকুর ছুটো। এই সামান্ত ধমক শুনে মোটেই যাবে না। এই বৃষ্টির মধ্যে যাবেই বা কোথায় !

বাসু হালদার জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকায় একবার। বৃষ্টি ধামবার কোনো লক্ষণ নেই। আজ আর কেউ আসবে না মনে হয়। বাসু হালদার আজ সন্ধ্যার মুখেই বাড়ী চলে যাবে ভেবেছিল। সেই সময়ই মুখিয়া ডোমটা এক ছিলাম গাঁজা সেজে এনে বলেছিল, 'একটু করে দেবেন নাকি, বড়বাবু !'

মুখিয়ার মুখে বড়বাবু ডাকটা বড় মধুর লাগে। এই ছনিয়ায় বাসু হালদারকে খাতির করে না কেউ, শুধু মুখিয়াই তাকে ওই নামে ডাকে। মুখিয়াটাও যেন কোথায় চলে গেছে। এই সময় আর এক ছিলাম গাঁজা পেলে মন্দ হতো না !

বাসু হালদার এই মক্শল শহরের ঘাটবাবু। তার কাজ হচ্ছে, কেউ মড়া নিয়ে এলে ডাক্তারের সাটিকিট আছে কিনা দেখে নেয়া আর মিউনিসিপ্যালিটির হুট টাকা ফি আদায় করা।

একটা পা ল্যাংড়া, জীবনে আর কোনো চাহুরী ছুঁত না। অনেক বছর আগে রসরাজ গুহ যখন এখানকার ছোয়ারম্যান ছিলেন তখন তিনি দয়া করে বাসুকে এই কাজটি বোঝাও করে দিয়েছিলেন। সেই থেকে বাসু হালদারকে সারা দিন-রাত অশান ঘরের ছোট্ট অকিস ঘরটাতেই

পড়ে থাকতে হয়। একটা পেট চলে যায়।

এরকম বৃষ্টিবান্দলার দিনে বাসু হালদার বাড়ী চলে গেলে কোনো ক্ষতি ছিল না। কেউ এলেও তাকে বাড়ী থেকে আনাতো নিজের গরজে, কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির বর্তমান চেয়ারম্যান পঞ্চানন দাস সরকারের মায়ের এখন তখন অবস্থা। যে-কোনো সময় টেস্টে যেতে পারে। ওরা বাড়ীর মরাকে বাসি করে না, যদি এই মাঝ রাত্তিরেও এসে হাজির হয়, আর তখন যদি বাসু হালদারকে না পায়.....

বাসু হালদার একটা বিড়ি ধরালো। চেয়ার-টেবিলে বসে ঘুমালে দোষ নেই। কিন্তু ঘুম যে আসছে না। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক। ইস, যদি মুখিয়াটাও থাকতো এই সময়ে।

হঠাৎ অপটভাবে মাঝবৃদ্ধনের আওয়াজ শুনানো গেল। 'বল হরি! হরি বোল!' হ'ক দিচ্ছে। তা হলে চেয়ারম্যানের মা গত হয়েছেন। আহা, কি মাতৃভক্তি চেয়ারম্যান বাবুর, এই বৃষ্টির মধ্যেও পোড়াতে আনতে ভোলেননি। চিতা জ্বলবে কি করে, সে খেয়াল নেই। যাই হোক, ওরা বড়লোক, বেশ খরচ খরচা করবে মনে হয়।

বাসু হালদার ঘর থেকে বেরুবার আগেই কয়েকজন লোক একটা মড়ার খাটীয়া ঘাড়ে করে তার ঘর ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল চুলির দিকে।

বাসু হালদার বুললো, এতো চেয়ারম্যান বাবুর মা নয়। তাহলে সঙ্গে অনেক লোক থাকতো। অনেক চে'চামিচি অনেক ধূধাম। তাহলে আর ব্যস্ততা দেখিয়ে কি হবে।

সে নিজের টেবিলে গাঁট হয়ে বসে রইলো। আশুক না, ওরাই আশুক। ঘাটবাবুর অফিসে আর কোনো কর্মচারী না থাকলেও, সেই তো বড়বাবু।

বেশ কিছু সময় কেটে গেল। ওরা কেউ এলো না। আর কোনো সাড়া শব্দও পাওয়া গেলো না। কৌতুহলে বাসু হালদার বেরিয়ে এলো।

বৃষ্টি অকস্মাৎ ধরে এসেছে। গুঁড়ি গুঁড়ি করে পড়ছে, তবে আর বেশীক্ষণ চলবে না বোকা যায়। কয়েকজন লোক মড়ার খাটী পাশে নামিয়ে রেখে নিজেরাই কাঠ সাজাতে শুরু করেছে।

বাসু হালদার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'কি ব্যাপার?' লোকগুলো একটু চমকে উঠলো। তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বলল, 'ডোম-

টোম কাউকে দেখছি না, তাই আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা করে নিচ্ছি।'

বাসু হালদার ভুক কুঁচকে বলল, 'ব্যবস্থা করে নিচ্ছেন মানে? মড়া রেজিষ্ট্রি করতে হবে না?'

'মড়া রেজিষ্ট্রি? সে আবার কি?'

'বা! যে কোনো মড়া এনেই আপনারা পুড়িয়ে ফেলবেন? একি বেওয়ারিশ কারবার নাকি?'

লোকটা একমুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'ঠিক আছে, রেজিষ্ট্রি করে নিন। 'ক'টাকা লাগবে?' লোকটি জামার পকেট থেকে কস্ করে ছ'খানা দশ টাকার নোট বের করে দিল। অন্য লোকগুলো হুপচাপ দাঁড়িয়ে।

বাসু হালদার সবার দিকে একবার চোখ বুলালো। কেউই তার চেনা নয়। এরকম ছোট শহরে এতগুলো অচেনা লোক।

বাসু হালদার মুখ ঘুরিয়ে মড়ার খাটের দিকে তাকাল। একটা বুঝী মেয়ের মুখখানা শুধু দেখা যাচ্ছে। শরীরটা একটা মোটা কবল দিয়ে ঢাকা।

শ্মশানের ঘাটবাবুর দয়া মায়া বলতে নেই। মড়া দেখতে দেখতে চোখ পড়ে গেছে। তবু বাসু হালদার জিজ্ঞাস করলো, 'কি হয়েছিল?'

'কলেরা। হঠাৎ, মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। আহা!' লোকটি খুব ছুঁতের ভাব দেখিয়ে কুঁপিয়ে উঠলো। তারপর দশ টাকার নোট ছ'খানা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নিন। বৃষ্টি ধরে এসেছে, চটপট কাজ শুরু করে ফেলি।'

বাসু হালদার বলল, 'ডোম না এলে আপনারা কি করবেন? চিতা সাজানো কি সহজ কথা?'

'ও আমরা ঠিক ব্যবস্থা করে ফেলবো।'

বাসু হালদার এবার গভীরভাবে বলল, 'কই দেখি ডাক্তারের সার্টিফিকেট।'

যে লোকটা এগিয়ে এসে কথা বলছিল, সে একটু যেন চমকে গেল। তারপর অশ্রুদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিরে, ডাক্তারের সার্টিফিকেট-খানা কার কাছে রাখলি?'

একজন বলল, 'সেটা বোধ হয় ফেলে এসেছি।'

বাসু হালদার কড়া হয়ে বলল, 'কেলে এসেছেন?' জানেন না, স্মশানে মড়া নিয়ে এলে সাটিক্রিকেট আনতে হয়? যান, একুণি নিয়ে আসুন।'

'এই বৃষ্টির মধ্যে আবার যেতে হবে?'

'নিশ্চয়ই!'

'আপনি এই কুড়িটা টাকা রাখুন না।'

'টাকার কথা পরে। আগে সাটিক্রিকেট দেখি।'

আর একজন লোক পকেটে হাত দিয়ে বলল, 'ও, এই তো, সাটিক্রিকেট আমার কাছেই রয়ে গেছে।'

সোকাটা পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে দিল, তাতে কিছু একটা লেখা ছিল, এখন জলে ভিজে একেবারে বাপসা হয়ে গেছে।

'এটা কি? এটা তো কিছুই পড়া যাচ্ছে না!'

'জলে ভিজে গেছে, কি করবো?'

'তা বললে তো, চলবে না। রুগ্মী কিসে মরল, সেটা তো খাতায় লিখতে হবে।'

'বললাম তো, কলরায়।'

'আপনার মুখের কথায় তো হবে না। ডাক্তারের লেখা চাই।'

লোকটা এবার একেবারে কাছে এসে বাসু হালদারের হাতে নোট ছ'খানা গুঁজে দিয়ে বলল, 'কেন আর বামেলা করবেন? খাতায় যা হোক একটা কিছু লিখে নিন না।'

বাসু হালদার হাত সরিয়ে নিয়ে বলল, 'ওসব চলবে না।'

মনে লেগেছে বাসু হালদারের। সে এই ঘাটের 'বড়বাবু।' তার একটা মাত্র পেট, সে টাকা-পয়সার পরোয়া করে না। তাকে ঘুঘু দিতে আসা।

বাসু হালদার নীচ হয়ে মড়ার গা থেকে কবলখানা এক টানে তুলে কেলল। তারপরই একটা-আর্ত চিংকার বেরিয়ে এলো তার মুখ থেকে।

মৃত যুবতীর বুক ও সারা শরীরে জমাত বাঁধা রক্ত। বুক ও পেট কাল কাল করে চেরা। কেউ যেন একটা ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাকে কুপিয়ে কুপিয়ে কেটেছে।

দৃশ্যটা দেখেই বাসু হালদার ভীষণ ভয় পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। তার মনে হলো, এবার ওরা তাকেও কুপিয়ে কুপিয়ে কাটবে।

একটু অপেক্ষা করে বাসু হালদার দেখলো, কেউ তাকে মারছে না। তখন সে মুখ থেকে আন্তে আন্তে হাত সরাল। তাকিয়ে দেখলো, আর কেউ নেই কোথাও। লোকগুলো দৌড়ে পালিয়েছে।

খুনের মড়া নিয়ে এসেছিল লোকগুলো। বৃষ্টির রাতে গোপনে গোপনে পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা ছিল। যদি চেয়ারমান বাবুর মায়ের অস্থ না করতো, তাহলে বাসু হালদার কিছু জানতেই পারতো না।

দশ টাকার নোট ছ'খানা পাশেই পড়ে আছে। সে ছটো যেন কাকড়া বিছে। ছুঁতেও ভয় করলো বাসু হালদারের। তাড়াতাড়ি সে মৃত দেহটার ওপরে কবলটা টেনে দিল আবার।

এরপরই বাসু হালদারের ইচ্ছে হলো দৌড়ে পালাতে।

এক ছুটে যদি সমস্ত চেনা লোকের জগৎ থেকে দূরে পালিয়ে যাওয়া যেতো। কিন্তু এই বৃষ্টি-কাদার মধ্যে খোঁড়া পায়ে সে কত দূরেই বা দৌড়ে যাবে। পালাবেই বা কোথায়?

এখন বাসু হালদারের কর্তব্য হচ্ছে পুলিশে খবর দেয়া। খুনের মড়া কারা এসে কেল রেখে গেছে স্মশানে, পুলিশই এখন এর দায়িত্ব নেবে।

কিন্তু থানা এখান থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে। এই দুর্ভাগ্যের রাতে তিন মাইল রাস্তা সে যাবে কি করে।

এখান থেকে আশ মাইল হেঁটে গেলে কেঁটপুরের মোড় থেকে রিক্সা পাওয়া যায়। তবে এতো রাতে সেখানে কোন্ রিক্সাওয়ালা বসে থাকবে? আঃ কি যে করা যায় এখন। ভয়-ভাবনায় বাসু হালদার ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো।

ঘোর ভাঙল একটা কুকুরের কুঁই কুঁই শব্দে। কুকুরটি মৃতদেহের কাছে এসে শুঁকছে।

বাসু হালদার আবার ধাতস্থ হয়ে কুকুরটাকে তাড়া দিল, 'হুস! হুস!' কুকুরটা যদি আবার মড়াটাকে টেনে নিয়ে যায়, তাহলে কেলদারী। কুকুরটাকে একটা চেলা কাঠ তুলে ছুঁড়ে মারতেই তবে সেটা একটু দূরে গেলো।

অশানে বহু রাত্রে বাসু হালদার একা কাটিয়েছে, কিন্তু কোনোদিন তার এমন ভয় হয়নি।

মৃতদেহটির দিকে আর একবার তাকাল। শুধু মুখখানা দেখে কিছুই বোঝা যায় না। ফুটফুটে একটি যুবতীর মুখ। যেন একবার ডাকলেই জেগে উঠবে।

এখন তো এই মড়া কেলে রেখে পুলিশ ডাকতে যাওয়ার আর প্রশ্নই ওঠে না। কুকুরে যদি মড়া টেনে নিয়ে যায় তাহলে আবার সে কোন ক্যাদাদে পড়বে কে জানে! যে লোকগুলো মৃতদেহটি এনেছিল, তারা সবাই অচেনা। বাসু হালদার পুলিশকে তাদের হাদিশ কিছুই দিতে পারবে না। অথচ কোনো জায়গা থেকে তারা এই খুনের মড়া নিয়ে এসেছে।

বাসু হালদার আর দাঁড়াতে পারছে না। আস্তে আস্তে বসে পড়লো মড়াটার খাটিয়ার পাশে। আবার ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। ইস্ ভিজে যাচ্ছে মেয়েটা। ঠিক যেন একটা জ্যাস্ত মেয়ে, ঘুমিয়ে পড়েছে, আর বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছে তার মুখ।

নিজের অজ্ঞাতেই বাসু হালদার হাতটা বাড়িয়ে মেয়েটির মুখ থেকে জল মুছে দিতে গেলো।

কর্সা সরল মুখখানা। এরকম কোনো সুন্দরী যুবতীর এতো কাছাকাছি কখনো বসেনি বাসু হালদার। যদি জীবিত থাকতো মেয়েটি, তাহলে তার গালে এরকম হাত দিলে সে রেগে চেঁচিয়ে উঠতো না?

আহা সত্যিই যদি তাই হয়। বাসু হালদারের ওপর রাগ করার জন্মই মেয়েটি যদি বেঁচে উঠে। সে যতো ইচ্ছে রাগ করুক, তবু বেঁচে উঠুক। এরকম একটা সুন্দরী মেয়েকে কোন পাষাণ খুন করলো?

বাসু হালদার মেয়েটির গালে আবার হাত রাখল। কিন্নর স্পর্শ। কতকণ আগে মারা গেছে কে জানে। এতো বৃষ্টিতে ভিজেছে, তবু তার গা-টা তো সে রকম ঠাণ্ডা নয়। যেন বেঁচে আছে।

বাসু হালদার মেয়েটির গালে একটা টোকা মেরে বলল, 'জেগে ওঠো, অনেককণ তো ঘুমালে।'

নিজেই হাসলো বাসু হালদার। একখনো হয়!

মেয়েটির শরীরে অন্তত পনের বিশটি ছোরার আঘাত। শুধু একে খুন করেনি, কেউ যেন প্রতিহিংসা নেবার জন্যই এর সুন্দর শরীরটা কালা কালা করে কেটেছে।



কিছুকণ খাটিয়ার পাশে বসে থেকে বাসু হালদার মেয়েটিকে ভালোবেসে কেললো। তার নিঃসঙ্গ জীবনে এ-ই যেন একমাত্র নারী, যার গালে হাত দিলেও প্রতিবাদ করে না।

চুমু খেলে? একে একটি চুমু খেলে কি রাগ করবে?

এই চিন্তায় বাসু হালদার এমনই উতলা হয়ে উঠলো যে নিজেকে আর সামলাতে পারল না। সে মুখটি এগিয়ে এনে মেয়েটির ঠাণ্ডা রক্তহীন

ঠেঁটে নিজে ঠেঁটি রাখলো।

তখন যুগ মেয়েটি কিসকিস করে বলে উঠলো, 'আমার নাম অঞ্জলি সরকার। সোনাবাড়ী গ্রামের রতন নাগ আমাকে খুন করেছে। তুমি একই দেখো.....'

ছটিকে খানিকটা দূরে পড়ে গিয়ে বাসু হালদার গৌঁ গৌঁ শব্দ করতে লাগলো। অজ্ঞান হয়ে গেলো অবিলম্বেই।

পরের দিন বাসু হালদারের জ্ঞান ফিরেছিলো ছপুর বেলা। সে অনবরত চিন্তার করছিল, 'রতন নাগ, সোনাবাড়ীর রতন নাগ।'

পুলিশ রতন নাগকে গ্রেফতার করে তাকে দিয়ে স্বীকারোক্তি করাবার পর বাসু হালদার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়।

[লিখেছেন : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়]

www.banglabookpdf.blogspot.com

মৃত্যু নয় অন্য কিছু

প্রাচীন কালের ঘটনা।

উষা গাঁয়ে বাস করত ছ'জন কাঠুরে। ছ'জনের মধ্যে একজন ছিল যুবক। তার নাম ছিল শ্যাম। আর একজন ছিল প্রৌঢ়। তার নাম ছিল হরলাল।

শ্রাম এবং হরলাল রোজ ভোরবেলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতো। দু'রাঙলের জঙ্গলে গিয়ে তারা কাঠ কাটতো সারাদিন, সন্ধ্যার কিছু আগে তারা কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতো।

বেশীর ভাগ দিনই শ্রাম এবং হরলাল বাড়ীতে পৌঁছাত বেশ রাত করে। জঙ্গল থেকে কেটে আনা কাঠ তারা রোজ রোজ বিক্রি না করে হুগুয় একদিন হাটে গিয়ে বিক্রি করতো। যা আর হতো তাতে তাদের ছটো সংসার বেশ ভালই চলতো।

বেশ সুখেই ছিল হরলাল এবং শ্যাম।

হরলাল সংসারী লোক। তার জী, ছেলেমেয়ে, বৃদ্ধা মা আছে সংসারে। বড় ছেলেটি রুগ্ন, রুগ্না তার জীও। বড় মেয়েটি অবশ্য স্বাস্থ্যবতী এবং গাঁয়ের ধনী লোকদের বাড়ীতে কাজ করে ছ'পয়সা রোজগারও করে। বাড়ীটা হরলালের নিজেরই, কিছু জমিও আছে তার।

শ্রাম কর্মঠ এবং বলিষ্ঠ যুবক এবং তার বাবা-মা ভাই-বোন বা স্বামীস্বজন কেউ নেই। সে একা থাকে বাবার তৈরী করে রেখে যাওয়া বাড়ীতে। জমিও খানিকটা আছে তার, তবে শ্যাম সে জমিতে কোনদিন রুসল ফলাবার চেষ্টা করেনি।

একা থাকতে ভাল লাগে না শ্রামের। বিয়ে করা দরকার তার, সে বুঝতে পারে। কিন্তু কেউ কোনো প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসে না।

তারও খুব লজ্জা। এসব বিয়ে-টিয়ের ব্যাপারে কাউকে মুখ বুজে

বলতে পারে না নিজের মনের ইচ্ছার কথা। এভাবেই দিন কাটছিল। কিন্তু দিন যতাই কাটছিল শ্রাম ততই অস্থির হয়ে উঠছিল।

রোজ রাতে বাড়ী এসে রান্না করতে হতো শ্রামকে। রান্না করতে গিয়ে হাত পোড়াতো। কখনো লবণ না দিয়ে তরকারী রান্না করত। কখনও ভাতের ক্যান স্কেলতে গিয়ে হাঁড়িগুজ ভাঙই কেলে দিতো মাটিতে। সব কাজই করতে পারে সে কিন্তু সংসারের মেয়েলি কাজগুলো করতে গিয়ে তার কান্না পায়, সে ভীষণভাবে অহতব করে তার একটি বউ একান্তভাবেই দরকার।

বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখে শ্যাম। রঙিন রঙিন স্বপ্ন। সুন্দরী মেয়েরা তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে, সে যেন পরীদের রাজ্যে হারিয়ে গেছে, পরীরা তাকে সাদরে কাছে টেনে নিয়েছে, আপন বলে গ্রহণ করেছে, পরীদের রাণীর সাথে বিয়ে হয়েছে যেন তার।

কিন্তু স্বপ্নই। স্বপ্ন ভেঙে যেতেই দমে যায় শ্রাম, খারাপ লাগে বড় তার। দুমিয়ে পড়ার আগে রোজই সে ভাবে, কাল জঙ্গলে কাঠ কাটতে যাব, সেখানে হরত দেখা হবে আমার সাথে কোনো সুন্দরীর, সে আমাকে কাছে ডাকবে, ভালবেসে বলবে, আমাকে কি বিয়ে করতে চাও? সে রাজী হবে, বলবে, করব না মানে! আমি তো তোমার অপেক্ষাতেই আছি এতোদিন।

ভোরবেলাও এই রকম আশায় ভরে থাকে বুক। নিজ্ঞ মার্ঠের উপর দিয়ে জঙ্গলের দিকে হন হন করে হাঁটার সময়ও শ্যাম ভাবে আজ নিশ্চয়ই কোনো সুন্দরী কুমারীর সাথে দেখা হবে তার।

কিন্তু দিন যায় সপ্তাহ যায়, মাস যায়—শ্যামের সাথে কোনো সুন্দরী মেয়ের দেখা হয় না।

দিনে দিনে মনটা শুকিয়ে যেতে থাকে শ্যামের।

তারপর একদিন—

সেদিনই ভোরবেলা কাঠ কাটতে বেরিয়েছে হরলালের সাথে শ্যাম। জঙ্গলে ঢুক সারাদিন তারা কাঠ কাটলো। সন্ধ্যার আগেই কাঠের বোঝা বেঁধে নিয়ে তৈরী হলো তারা কেরার জন্ত। আকাশে মেঘ, তাই আজ তাদের বাস্তবতা। অজান্তে দিন আরো কিছু কাট

কাটে সাধারণত!

কেরার পথে বৃষ্টি। এবং ঝড়।

হন হন করে হাঁটছিল ওরা। বৃষ্টির জন্য খুব একটা অসুবিধা হচ্ছিল না তাদের। কিন্তু ঝড়ের দাপটে হুইয়ে যাচ্ছিল দু'জনেই। বাতাসের বেগ ক্রমশঃই বাড়ছে। জঙ্গল থেকে বেক্ষার আগেই বিপদের মুখো-মুখি হলো তারা। ঝড় ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল। ভেঙে পড়তে লাগল গাছের ডালপালা। সেই সাথে বিদ্যুৎ চমকচ্ছে, মেঘ ডাকছে, বহুপাত হচ্ছে। পথের হদিশ পাওয়া যায় না। মাথার উপর ঝুলছে বিপদ, যখন তখন গাছের মোটা ডাল ভেঙে পড়তে পারে মাথার।

পথ হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ল হরলাল ও শ্রাম। ঝড়ের উগ্ররূপ দেখে ভয়ে আতঙ্কিত হ'জনেই। আশপাশের গাছ ঝড়ের ধাক্কায় হয়ে পড়ছে সশব্দে মাটিতে। আশ্রয় পাবার জন্ত অস্থির হয়ে উঠল তারা। কিন্তু এই বন্ধভূমিতে নিরাপদ আশ্রয় কে দেবে!

গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ভগবানকে ডাকতে লাগল হরলাল। শ্যাম আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অন্ধকারের দিকে। কেরার কিছু নেই কারো। যে কোনো মুহূর্তে মাথার উপরে পড়তে পারে ভারী কোনো গাছ। অন্ধকার, দেখারও উপায় নেই কোন দিক থেকে আসছে বিপদ। ঝড় ঝড় করে ভাঙছে গাছপালা, সেই সাথে মেঘের গর্জন ধ্বনি, বাতাসের শাসানি—প্রলয়কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে চারদিকে।

জীবন এবং মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল তারা। এই দুর্ভাগ্যের হাত থেকে প্রাণ বাঁচবে এমন আশা হ'জনের কারো মধ্যে ছিল না। মৃত্যু অব্যাহারিত ধরেই নিয়েছিল।

কিন্তু সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা বোঝা ভার। তিনি কখন কি চান তা কে বলতে পারে।

ঝড় থামতে শুরু করল। হঠাৎ যেন ব্রেক কমে থমকে দাঁড়াল বাতাস। সেই সাথে থামল বৃষ্টি।

রাত গভীর তখন।

দুটুটে অন্ধকার চারদিক। পথের উপর পড়ে আছে গাছ, গাছের ডাল। পথ চেনা যায় না। পথের অস্তিত্বও নেই কোথাও কোথাও।

এক পা এক পা করে হাঁটছে তারা। কোনদিক থেকে কোনদিকে যাচ্ছে তা বোঝার কোন উপায় নেই, সে চেষ্টাও নেই তাদের। এগিয়ে যাওয়ারটাই এখন একমাত্র কাজ। কোথায় যাচ্ছে তা ভেবে লাভ নেই।

এভাবে হাঁটতে হাঁটতে ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

তারপর একসময় চাঁদ উঠল আকাশে। চাঁদের আলোয় পথ দেখতে পেলো তারা। হাঁটার গতি ক্রম হেলা তাদের।

হাঁটতে হাঁটতে, হাঁটতে হাঁটতে.....

একসময় হরলাল খমকে দাঁড়াল।

পিছন পিছন আসছিল শ্যাম। সে জানতে চাইলো, 'দাঁড়ালে কেন আবার হরদা?'

'শ্যাম!'

চমকে উঠল শ্যাম। হরদার গলায় ভয়। সামনে কি বিপদ? ভাবল শ্যাম। হরদার গলা অমন শোনাল কেন? কি বিপদ দেখেছে সে?

'শ্যাম!—আমার কেমন বেন সন্দেহ হচ্ছে।'

'সন্দেহ হচ্ছে?—দম বন্ধ করে জানতে চাইলো শ্যাম, 'কি মনে হচ্ছে?'

জবাব দিল না হরলাল। পিছন কিয়ে সে একবার তাকালও না শ্যামের দিকে। শ্যাম দেখতে পেলো হরদা মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার ডান দিক, বাঁ দিক এবং সামনের দিকে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে, কিছু যেন দেখার আশায় অপেক্ষা করছে। কান পাতলো শ্যাম। কোথাও কোনো শব্দ নেই। গাছের পাতাগুলোর কঁক গলে নেমে আসছে চাঁদের আলো। বনভূমিতে কোথাও চম্রালোক এবং কোথাও অন্ধকার। আলো-অঁধারি, আলো-ছায়া—বড়ই রহস্যময় লাগছে। কেন যেন গা ছমছম করতে লাগল শ্যামের।

'সন্দেহ হচ্ছে'—হরলাল ঢোক গিললো, 'নিশিতে পায়নি তো আমাদের? কত ঘণ্টা ধরে হাঁটছি তার ঠিক নেই। এখনও জঙ্গল থেকে বেরুতে পারলাম না কেন?'

শীতল হাত দিয়ে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল শ্যামকে ভয় আর আতঙ্ক।

'নিশিতে পেয়েছে মানে কি হরদা?'

'জঙ্গলে এরকম বিপদ হয়। হরলাল বলল, নিশি মানে তো জানি না, তবে খারাপ আত্মা কিংবা পেজী বা ভূতহুত হবে। তারা মানুষকে খালি হাঁটিয়ে থাকে। গোলক ধাঁধায় কেলে হাঁপিয়ে তোলে, একই পথে পাঁচশো বার নিয়ে যায় ঘুরিয়ে কিরিয়ে—তারপর মেরে কেলে নিজের আওতায় নিয়ে গিয়ে।

'হরদা?'

হরলাল বলে উঠল, 'আর সামনে এগোনো উচিত হবে না, বুলি শ্যাম। ডেবেচিভে মাথা ঠাণ্ডা করে দেখি আর, কি করা যায়। মনটা যেন কেমন করছে; সত্যি বোধ হয় পেয়েছে নিশি.....'

শ্যাম পা বাড়িয়ে হরলালের গা ঘেঁবে দাঁড়াল। চমকে উঠে সবগে পাশে তাকায় হরলাল। বলে উঠে, 'ও, ভূই!'

শ্যাম বলে, হরদা, দরকার নেই আর হাঁটা হাঁটি করে। এসো একটা গাছে চড়ে বসে থাকি সকাল পর্যন্ত।

'কিন্তু—হরলাল বলে, 'আমি ভাবছি অন্ধ কথা।'

শ্যাম নতুন করে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে, 'কি?'

'নিশিই হয়ত চাইছে আমরা আর না এগোই! হয়ত চাইছে আমরা এখানেই থেকে যাই। হয়ত এটাই তার এলাকা, এখানেই আমাদেরকে.....'

শ্যাম বলল, 'হরদা, চলো পালাই।'

'কিন্তু পালাব কোথায়? পালাতে দিলে তবে তো।'

হঠাৎ শ্যামের মনে হলো—হরদাই নিশি নয়ত?

ভয় অঁকড়ে ধরল তাকে আরো মজবুত করে আটপেপুটে।

আশপাশ থেকে কে যেন নাকি সুরে শব্দ করে উঠল। হরলাল চাপা গলায় বলল, 'শুনলি?'

'কি?'

আবার হলো শব্দটা।

‘ওই, আবার। কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে।’

শব্দটা এবার শুনতে পেয়েছে শ্যামও। কিন্তু মিহি স্বরটা ঠিক মানুষের না ভূতের না পাখির তা ঠিক বুঝতে পারল না সে।

‘ডাকছে নাম ধরে।’—হরলাল কাঁপছে ঠক ঠক করে। শ্যামের আজ আর রেহাই নেই আমাদের।’ হরলাল এবার কঁদে কেলবে বলে মনে হয়। www.banglabookpdf.blogspot.com

শ্যাম ভানদিকে তাকিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সাদা মতো একটা হাত দেখতে পাচ্ছে সে। অবিকল মানুষের মতো হাত। কিন্তু সাদা ধবধব করছে। হাতটা দ্রুত নড়ছে। হাতছানি দিয়ে ডাকছে যেন, তাদেরকে।

‘হরদা, ওই দেখো।’—শ্যাম কিসকিস করে বলল, ‘ভান দিকে ওটা কি বেলো তো?’

হরলাল সেদিকে তাকিয়ে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর বলল, ‘কই আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।’

‘ওই যে, হাত নেড়ে ডাকছে...’

‘আরে তাইতো!’—এবার দেখতে পায় হরলাল। ‘শ্যাম চল পালাই এবার। ওদিকে যখন ডাকছে তখন আর সন্দেহ নেই যে ওদিকটাই নিশির এলাকা। আর, ছোট।’

হরলাল পিছন ফিরে ছুটতে শুরু করল। আগে আগে ছুটছে শ্যাম। মাথার বোঝা তো আগেই কেলে দিয়েছে, এবার হাতের কুঠারও ফেলে দিল।

কিন্তু ছুটলে কি হবে, ধাওয়া করে আসছে যেন কারা। পিছনে শব্দ হচ্ছে, কে যেন হাসছে খিল খিল করে। এদিকে ছোট্টা নামে মাত্র। পথের উপর হাজারটা বাধা। এগুনোই হুফর। এগুচ্ছে দশ কদম তো পিছিয়ে আসতে হচ্ছে নয় কদম। তার উপর অন্ধকার। দিক তুল না হওয়াটাই আশ্চর্যের ব্যাপার।

কতক্ষণ একটানা দৌড়েছিল তা মনে নেই। একসময় থামল শ্যাম।

‘এ কোথায় এলাম?’

হরলাল হাঁপরের মত হাঁপাচ্ছে।

‘আশ্রয় একটা পাওয়া গেল যাই হোক।’

হাঁপা একটা কুড়েঘর দেখা যাচ্ছে বটে। চাঁদের আলোয় কেমন ছমছমে চারদিক। সামনের গাছপালার কণিক দিয়ে ছোটোখাটো একটা কঁকা জায়গা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সেই কঁকা জায়গাতেই কুড়েঘরটা দাঁড়িয়ে আছে।

‘কেউ দেখছি নেই আশেপাশে।’

শ্যাম বলল, ‘এতো রাতে কেউ কি আর জেগে আছে?’

শ্যাম বলল, ‘তবে চলো, হাঁকডাক দিয়ে জাগাবার চেষ্টা করি।’

হরলাল কিন্তু পা বাড়াল না। তার ভেতন যেন উৎসাহ নেই।

‘কি হলো?’

‘ভাবছি’—হরলাল বলল, ‘এটা কোথেকে এলো? এই জঙ্গলে তো আর নতুন নই আমরা। কোথেকে এলো এটা? বুঝিয়ে দে আমাদের শ্যাম। আগে কখনো দেখেছিস কুড়েটাকে?’

‘দেখিনি।’—শ্যাম স্বীকার করে নিয়ে যুক্তি দেখাল, ‘কিন্তু এই জঙ্গলের সবটা কি আর আমরা জানি? এদিকটায় আসিনি আগে।’

হরলাল চপ করে রইল।

‘কিছু বেলো এবার।’

‘চল, তবে মনটা আমার মানছে না বাপু।’—হরলাল পা বাড়াল অনিচ্ছাসত্ত্বেও, ‘অসং আখারা, নিশিরা নাকি জঙ্গলের ভিতর এরকম ঘর তৈরী করে—ক’দ আর কি!’

শ্যাম বলল, ‘তবে না হয় থাক।’—দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

‘কিন্তু দরজাটা যেন বন্ধ মনে হচ্ছে না?’

‘ভাতেকি।’ www.banglabookpdf.blogspot.com

‘দরজা যখন বন্ধ তখন ভয়ের কিছু নেই।’—হরলাল স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, ‘পেটেরা যদি ক’দ পেতে রাখতো তাহলে দরজা খোলা হা হা করতো।’

কুড়েঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ছুজন।

শ্যাম দরজার গায়ে হাত দিতে যেতেই হরলাল বাধা দিল, ‘এই

দাঁড়া!’ শ্যাম তাকাল। হরদা কি যেন চিন্তা করছে। আসলে চিন্তা করছিল না কিছু হরলাল, সে কান পেতে কি যেন শোনার চেষ্টা করছিল।

কান পাতল শ্যামও।

পিছন থেকে ভেসে এলো কর্কশ একটা শব্দ।

‘লক্ষণ ভালো না!’—চাপা কণ্ঠে বলে উঠল হরলাল, পাখির অমন গলা কখনো এর আগে শুনেছিলাম?’

শ্যাম চুপ করে রইল।

হরলাল পিছন থেকে তার পাশে এসে দাঁড়াল। দরজার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলে উঠল সে, ‘কে আছে! ভিতরে দয়া করে……’

ধাক্কা দিতেই খুলে গেল দরজা।

‘আরে, এয়ে দেখছি খোলাই।’

কুড়েররের ভিতর চাঁদের আলো। ভিতরে ঢুকে ওরা কাউকে দেখতে পেলো না।

‘মনটা কেমন যেন খারাপ হয়ে যাচ্ছে বাই বসি শ্যাম!’—হরলাল মেঝেতে ধপ করে বসে পড়ল।

‘তোমার মুখে শুধু ওই একই কথা সারাক্ষণ!’—ঘরের এক কোণে খড়ের স্তূপ। তার উপর বসে দেয়ালে ঠেস দিল শ্যাম, ‘এতো ভয় করলে কি চলে?’—আশ্রয় পেয়ে সাহস কিরে পেয়েছে সে, ‘রাত কতটুকুই বা আছে আর; দেখতে দেখতে ভোর হয়ে যাবে। এলো গল্প করেই সময়টা কাটিয়ে দিই।’

হরলাল বলল, ‘চুপ! শুনতে পাচ্ছি কারা যেন স্নোরে স্নোরে পায়ের শব্দ করে বাইরে হাঁটাচলা করছে?’

শ্যাম হেসে স্কলল।

বলল, ‘তোমার দ্বারা কিছু হবে না হরদা। কোথাও কিছু হাঁটছে না। ও তোমার মনের ভুল।’

হরলাল রেগে গেল। বলল, ‘সাবধানের মার নেই, বুঝলি?’ এবার কাঠের বোকা তো গেছেই, সেজন্তে চিন্তা করি না। কিন্তু কুঠার ছটো যে কেলে এলাম তার কি হবে?’

‘কি আবার হবে!’—হরলাল ঘরের অপরপ্রান্তে উঠে গিয়ে খড়ের গাদার উপর বসল, তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল, ‘সকাল বেলা খুঁজতে বেরুব। এ জঙ্গলে আমরা ছাড়া কেউ নেই। চুরি বাবার ভয় নেই। ঠিকই খুঁজে পাবো।’

‘শ্যাম?’

‘বলো।’

‘দরজাটা লাগিয়ে দিতে হয়। বন্ধ করা যায় কিনা দেখ দেখি।’

শ্যাম উঠল। দরজাটা পরীক্ষা করে বলল, ‘বিল আছে।’ খিলটা লাগিয়ে দিয়ে বলল, ‘লাগিয়ে দিলাম। আর কোনো ভয় নেই।’

হরলাল বলে উঠল জড়ানো গলায়, ‘আর চিন্তা করতে পারি না। যা হবার হবে। তগবান দেখবেন……হরলালের ওটাই শেষ কথা। এরপর সে আর মুখ খুলার সুযোগ পায়নি।

হরলাল ঘুমিয়ে পড়লেও শ্যাম চেষ্টা করে জেগে রইল খানিকক্ষণ। প্রচণ্ড পরিশ্রম গেছে শরীরের উপর দিয়ে, তার উপর রাতে খাওয়া হয়নি, ঘুম তো পাবেই।

কিন্তু ভয় করছিল বলে ঘুমতে সাহস পাচ্ছিল না শ্যাম। ভয় হচ্ছিল ঘুমলে যদি কেউ আসে, এসে বুকে উঠে বসে, গলা চেপে ধরে মেরে ফেলে……!

কিন্তু ঘুমের সাথে যুদ্ধ করে টিকতে পারল না শ্যাম, ঘুমিয়ে পড়ল সে একসময়……

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগার ঘুম ভেঙ্গে গেল শ্যামের। ঘুম ভাঙতেই দেখল তার সর্বশরীর ভিজে গেছে। বাইরে তুমুল বর্ষণ শুরু হয়েছে আবার। সেই সাথে উগ্রমুষ্টিতে ছুটোছুটি করছে বাতাস। আবার ঝড় এসেছে। ঘরের দরজাটা খোলা, হাঁ হাঁ করছে কপাট ছটো। বাড়ি ফিরিয়ে হরদার দিকে তাকালো শ্যাম। সেই মুহূর্তে স্বপ্নপিও তড়াঙ্ করে লাকিয়ে উঠল বৃকের ভিতর।

সাদা পোশাক পরা একটি মেয়েকে দেখতে পেল শ্যাম। না, স্বপ্ন দেখছে না সে, নিজেই চিমটি কাটল, নিজের মাথার চুল ধরে টানল

২—ভৌতিক গল্প—২

বার কয়েক—ভাবছে, অর্থাৎ স্বপ্ন দেখছে না সে। মেয়েটি বসে আছে হরলালের বৃকের উপর কুঁক পড়ে নিঃশাস ছাড়ছে সে। শ্রাম আতঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখল মেয়েটির নিঃশাস আগুনের শিখার মতো, হরলালের মুখের উপর সেই অগ্নিশিখা পড়ছে।

হঠাৎ ঝট করে মেয়েটি তাকাল শ্রামের দিকে।

শ্রাম যত্নাভয়ে অস্থির হয়ে উঠল। তার ইচ্ছা হলো, উঠে দাঁড়িয়ে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পৌঁছে দেয়।

কিন্তু মেয়েটি হরলালের বৃকের উপর থেকে নেমে এগিয়ে আসছে তার দিকে। শ্যাম চেষ্টা করল চীৎকার করে উঠতে। পারল না। সে শক্তি তার মধ্যে নেই।

ধীরে ধীরে শ্রামের বৃকের উপর বসল মেয়েটি।

আতঙ্কে বিক্ষারিত চোখের ভিতর থেকে মলি ছুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নিঃশব্দে দেখছে শুধু শুধু শ্রাম। করার কিছু নেই তার। শরীরে এক বিন্দু শক্তি পাচ্ছে না সে। মেয়েটি ধীরে ধীরে নামিয়ে আনছে তার মুখের কাছে মুখটা—নামছে, আরো নামছে।

মেয়েটির মুখটায় কি ছিল বলতে পারবে না শ্রাম, কিন্তু ঘরটা আলোকিত হয়ে উঠেছে তার মুখের সেই আলোয়। অদ্ভুত স্নন্দর একটি মুখ, কোনো মেয়ের এমন রূপ হয় ভাবা যায় না। শ্রামের মুখের একেবারে কাছে নামিয়ে এনেছে মেয়েটি নিজের মুখ। শ্রামের দিকে চেয়ে রইল সে কিছুক্ষণ। তারপর হাসল এবং বলল, 'বড় মায়ী হচ্ছে তোর ওপর। বরসটা তোর কম, তাছাড়া ভারী স্নন্দর দেখতে তুই—এই মাত্র যুবক হয়েছিল, লোহার মতো পেটা শরীর, টকটকে তাজা—থাক, শ্রাম। তুই বরং বেঁচেই থাক। কিন্তু খবরদার! এই ঘটনার কথা ফোনোদিন যদি কাউকে বলিস তাহলে, তোর আর রক্ষা নেই। আবার নিষেধ করছি, কাউকে নয়, এমন-কি তোর বউ যে হবে তাকেও বলবি না এক কথা। যদি বলিস, আমি তা জানতে পারব, আমার হাতে তোর মরণ ঘটবে, মনে রাখিস যা বললাম……'।

কথাগুলো বলে শ্রামের বৃকের উপর থেকে নামল সেই অপরূপ স্নন্দরী মেয়েটি। চোখের পলকে ঘুরে দাঁড়িয়ে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে

বেরিয়ে গেল সে।

খোলা দরজার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল শ্যাম। বৃকের ভিতর ভয়ের একটা জমাট তার অন্তর্ভব করছিল সে। তখনো তার নড়াচড়ার শক্তি নেই। বাইরে তুলুল বর্ষণ এবং বাতাসের মাতামাতি তখনও ধামেনি। শ্যাম শুয়ে শুয়ে গাছের ডাল ভান্ডার শব্দ শুনতে লাগল।

একসময় সকাল হলো। সাহস করে উঠে বসল সে। তাকিয়ে দেখল হরদা তেমনি ভাবে শুয়ে আছে। আস্তে আস্তে দাঁড়াল সে। এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল হরদার সামনে। হরদার মুখের দিকে তাকিয়ে বৃকটা ছাত করে উঠল। কান্না পেলো তার হঠাৎ করে। গায়ে হাত দিয়ে দেখার আগে সে বুঝতে পেরেছে হরদা বেঁচে নেই……

দেখতে দেখতে বছর ঘুরে গেলো। সেই আগের মতোই ভোরবেলা উঠে জঙ্গলে কাঠ কাটতে যায় শ্যাম। কেরে সেই সন্ধ্যার সময়। তবে জঙ্গলে সন্ধ্যা করে না শ্যাম। বিকাল থাকতে থাকতেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে সে।

হরলাল মারা গেছে। সবাই জানে ঝড়ের কবলে পড়ে মরেছে সে। শ্যাম আজ পর্যন্ত প্রকৃত ঘটনা কাউকে বলেনি। সে রাতের কথা মনে পড়লে আজও তার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায় ভয়ে। সেই মেয়েটির কথা সে পরিকার স্মরণ করতে পারে। সে যে মানুষ ছিল না তা সে বুঝতে পারে। তবে মানুষ হোক, পেত্রী হোক, পরী হোক বা বাই হোক, তার প্রতি শ্যাম কৃতজ্ঞ। হরদার মতো সে তাকেও মেরে ফেলতে পারতো, কিন্তু মারেনি। এটাই আসল কথা। শ্যাম তার দয়ার কথা কখনো ভুলবে না। বলবেও না সেই ঘটনার কথা কাউকে নিজের প্রাণ থাকতে।

বিয়ের কথা এখনো ভাবে শ্যাম। গত এক বছরে বিয়ে করার চেষ্টাও সে করেছে কয়েকবার। কিন্তু সেই রাতে সেই মেয়ের রূপ দেখার পর থেকে কি যে হয়েছে তার, কোনো মেয়েকেই পছন্দ হয় না। গ্রামের প্রধান লোকেরা শ্রামের শুভানুধ্যায়ী তারা চেষ্টা করেছিল বিয়ে দেবার। মেয়ে দেখতেও গিয়েছিল শ্যাম অস্ত্র গ্রামে। কিন্তু মেয়ে দেখে পছন্দ হয়নি তার। শ্যাম ইতিমধ্যে একটা ব্যাপারে অন্তত সিদ্ধান্ত নিয়ে

ফেলেছে। বিয়ে সে করবে না তা নয়। বিয়ে করবে, কিন্তু মেয়েটিকে হতে হবে বেশ সুন্দরী। সুন্দরী মেয়ে পেলে ভালো, তা নয়ত সে সারা জীবন অবিবাহিতই থাকবে, বিয়েই করবে না।

দিন বেশ কাটছিল। তারপর একদিন.....

কাঠের বোকা মাথার নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটি গ্রামের ভিতর দিয়ে বাড়ীর পথে হন হন করে কিরছিল শ্যাম।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে তখন। গ্রামের মাঠখানেই সে একটি মেয়েকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল। একটি বট গাছের তলায় বসে আছে মেয়েটি। যেন কঁাদছে, মুখে অঁচল চাপা দিয়ে।

কাছে গিয়ে দাঁড়াল শ্যাম।

‘কে গো তুমি? এখানে কি করছ এই সন্ধ্যাবেলা?’

মেয়েটি সত্যি কঁাদছিল।

শ্যামের সাজা পেয়ে সে আরো জোরে হুঁপিয়ে হুঁপিয়ে কঁাদতে লাগল।

‘কি হয়েছে তোমার? থাকো কোথায়?’

মেয়েটি একটি গ্রামের নাম বলল। সে অনেক দূরের গ্রাম।

‘এখানে কি করতে এসেছ? কার কাছে এসেছ?’

মেয়েটি যা বলল তার অর্থ দাঁড়ায় এই রকম: তার বাবা তার মাকে ভ্যাগ করে বেশ ক’বছর আগে। সে বাবার কাছেই বড় হয়েছে। গত ক’দিন আগে মারা গেছে তার বাবা। যুবতী, অবিবাহিত মেয়ে, কোথায় থাকবে? তাই এসেছিল এই গ্রামে, তার মায়ের কাছে। কিন্তু এখানে এসে সে জানতে পেরেছে তার মাও মারা গেছে কিছু আগে। মা পরে যাকে বিয়ে করেছিল সেই লোকটা তাকে আশ্রয় দেয়নি। সে এখন একা এবং অসহায়।

বাবা-মা শ্যামেরও নেই। মেয়েটির জন্ত ভারী দুঃখ হলো তার। কিন্তু তার নিজের বাড়ীতে লোকজন নেই, মেয়েটিকে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দেবার প্রশ্নই ওঠে না। কিছু করার ইচ্ছা থাকলেও তার উপায় নেই।

‘এখন কি করবে বলে ভাবছো?’

এই প্রশ্নে মেয়েটি আবার কঁাদতে লাগল। তারপর বলল, গলায় দড়ি দেবে সে।

বিচলিত হয়ে পড়ল শ্যাম, মেয়েটি কত দুঃখে কথাটা বলছে তা সে বুঝতে পারল। তাছাড়া, গলায় দড়ি দিয়ে মরার চেষ্টা করা বিচিত্র কিছু নয়। তার মা যখন মারা যায় তাকে একা ফেলে, তখন তারও ইচ্ছে হয়েছিল বিষ খেয়ে মরতে.....।

‘আমার সাথে যাবে তুমি? আমাদের গাঁয়ে? দেখি, কোথাও তোমার জায়গা হয় কিনা।’

মেয়েটি রাজী হলো যেতে। এতোকণ মুখ লুকিয়ে কঁাদছিল সে। এবার চোখের জল শাড়ির অঁচলে মুছে উঠে দাঁড়াল সে। এই প্রথম মেয়েটিকে স্বপ্ন আলোয় দেখল শ্যাম।

মেয়েটিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল শ্যাম। সেই মুহূর্তে তার ইচ্ছা হলো বিয়ে করলে এমন মেয়েই দরকার। সত্যি এমন রূপ কমই দেখা যায়।

আগে আগে নানা রঙিন স্বপ্ন দেখতে দেখতে হ’টিছে শ্যাম। পেছনে মেয়েটা। খানিক পর পরই ষাড় কিরিয়ে চন্দ্রের আলোয় মেয়েটিকে দেখে নিচ্ছে সে। আগুনের মতো জ্বলছে যেন মেয়েটার রূপ, চোখ কেমনো ছকর। শতবার সহস্রবার দেখেও দেখবার সাধ মেটে না।

গ্রামের মোড়লের বাড়ীতে নিয়ে গেল শ্যাম মেয়েটিকে। মোড়ল বাড়ী নেই, মোড়লের বউকে সবকথা বলে মেয়েটিকে আপাতত: আশ্রয় দেবার অনুরোধ করল সে। মেয়েটিকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখল মোড়লের বউ। কয়েকটা প্রশ্ন করে জেনে নিল আগাগোড়া সবটা ইতিহাস। সব শুনে রাজী হলো সে। মুচকি হেসে শ্যামকে বৃদ্ধা বলল, ‘তা হ্যাঁ রে শ্যাম, তোকে আমরা বোকা বলি, আর তোর পেটে এতো বুদ্ধি! এমনো পরীকে তুই বেছে নিয়ে এসেছিস কি আর এমনি! কিন্তু তুইতো কালো-খাঁদা, এমন পরীর মতো মেয়েকে বউ করে ধরে রাখতে পারবি তো?’

শ্যাম লক্ষ্যায় এতোটুকু হয়ে গেল। মনে মনে মেয়েটিকে ঘিরে সে যে স্বপ্নই দেখুক, কেউ যদি সামান্যসামান্য এমনভাবে বলে তাহলে কার না লজ্জা হয়।

পরদিন গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল কথাটা। যার সাথে দেখা হয় সেই হাসে, বলে, 'ভালো একটা বউ পেয়েছিস বাপু তুই! তোর পছন্দ আছে বলতে হয়!'

গ্রামের লোকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করল, 'শ্যাম যেমন সং ছেলে, যেমন কর্মঠ ছেলে, তেমনি একটি সুন্দর মেয়েকে বউ হিসেবে পেতে যাচ্ছে। ছেলেটার পছন্দই হচ্ছিল না কোনো মেয়েকে। ভগবান ওর মনের মতো সুন্দরী মেয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন শেষ পর্যন্ত।'

এতো কথার পর বিয়েটা হওয়া সহজ অর্থাৎ সম্ভব হয়ে উঠল। শান্তার সাথে বিয়ে হয়ে গেল ধুমধামের সাথে শ্যামের।

সুখী জীবন। সুন্দরী বউ পেয়ে শ্যাম যেমনি আনন্দিত, শ্যামের মতো বলিষ্ঠ, কর্মঠ এক চরিত্রবান স্বামী পেয়ে শান্তাও যারপর নাই মহাখুশী।

শান্তা নিজেকে সুগ্রহিণী হিসেবে প্রমাণিত করল মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই। স্বামীকে সে দেবতার চেয়েও বেশী ভালবাসে। আদর-যত্নে স্বামীকে সে পারে তো মাথায় তুলে রাখে। অন্ধকার থাকতে ঘুম থেকে উঠে রান্না করে, স্বামীকে নিজের কাছে বসিয়ে রোজ খাওয়ান। ছপূরের জন্ত বেঁচে দেয় প্রচুর খাবার। শ্যাম কাঠ কাটতে চলে যায়। সারাদিন সংসারের কাজে মগ্ন থাকে শান্তা। সন্ধ্যার পর ফেরে শ্যাম। শীতকাল হলে পানি গরম করে দেয় শান্তা। শ্যাম হাত-পা ধুয়ে খেতে বসে। গ্রীষ্মকাল হলে, পাখা হাতে পাশে বসে বাতাস করতে শুরু করে শান্তা। শ্যাম বিশ্রাম নেয়।

দেখতে দেখতে কয়েক বছর কেটে গেল।

ছ'টা ছেলেমেয়ে হয়েছে ওদের। এখনও কাঠ কাটে শ্যাম। গ্রামে ওদের ছুজনের খুব প্রশংসা। বিশেষ করে শান্তার কথা নিয়ে আলোচনা হয় না এমন দিন নেই। গ্রামের সবাই একবাক্যে স্বীকার

করে, শান্তার মতো মেয়ে হয় না! স্বয়ং ভগবান ওকে পাঠিয়েছেন শ্যামের ঘরে।

গ্রামের মানুষের মুখে আরো একটা কথা শোনা যায়। বয়স মানুষ মাত্রেরই বাড়ি। শুধু মানুষের কেন, এমন কোন জিনিস নেই, যার বয়স বাড়ি না। কিন্তু শান্তা বৃদ্ধি ব্যতিক্রম। সে বিয়ের দিনে যেমন ছিল আজ দশ বছর পরও তেমনি আছে। দেখলে মনে হয় ষোলো বছরের কুমারী। সেই বয়স সেই বয়সই আছে, সেই রূপ সেই রূপই আছে।

তারপর একদিন.....

ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে। শান্তা ছ'পা ছড়িয়ে দিয়ে আলোর সামনে বসে বসে কাঁথা সেলাই করছে। ছেলেমেয়েদের সাথেই শুয়ে আছে শ্যাম। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে স্ত্রীর দিকে। হঠাৎ সে বলে উঠল একসময়, 'তোমাকে দেখে আজ আমার অনেকদিন আগের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে শান্তা। তোমার রূপ সত্যি এমন দেখা যায় না। তোমার রূপের সাথে তুলনা করা যেতে পারে—এমন রূপ জীবনে মাত্র একবার দেখেছিলাম বটে। তখন আমার বয়স হবে সত্তেরো কি আঠারো। সেই বয়সে একটি মেয়েকে দেখেছিলাম আমি, সে তোমার মতোই সুন্দরী ছিল। দেখতেও অনেকটা তোমার মতোই ছিল সে।'

সেলাই থেকে মুখ না তুলেই শান্তা সর্কোতুকে জানতে চাইল, 'কে সে? কোথায় তাকে দেখেছিলে?'

শ্যাম এরপর বলতে শুরু করল। দশ বছর অতীত হয়ে গেছে। কিন্তু সেই বিভীষিকাময় রাতের কথা সবই মনে আছে শ্যামের। ধীরে ধীরে সেই জন্মের কথা, বৃষ্টির কথা, ঝড়ের কথা, কুড়ের কথা, সেই অদ্ভুত সুন্দরী মেয়ের কথা, মেয়েটির আচরণের কথা, তার বুকের উপর বসে কিস কিস করে মেয়েটি তাকে কি বলেছে সে-কথা—সবই বলল শ্যাম। অবশেষে, উপসংহারে সে বলল, 'জগে বা স্বপ্নের মধ্যে, সেই প্রথম তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে দেখি আমি আমার

জীবনে। কোন সন্দেহ নেই, সে মাহুয ছিল না। তাকে যমের চেয়েও বেশী ভয় লেগেছিল আমার। ইস্‌! অমন ভয় আবার পেলে নির্ধাৎ আমি মারাই যাবো! সত্যি, মেয়েটির প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। সে হচ্ছে করলেই আমাকে মেরে কেলতে পারতো.....’



শাস্তা আচমকা তার হাতের কণ্ঠা ছুঁড়ে কেল দিয়ে ভড়াক করে উঠে দাঁড়াল। পর মুহূর্তে ডাইনী মতো ফলে উঠল সে। তার নিঃশ্বাস হয়ে উঠল আগুনের শিখা। চীৎকার করে বলে উঠল, ‘আমি! আমি! আমি!—তোর সেই মেয়েটিই আমি! মনে নেই সেই ঘটনার

কথা বললে তোকে আমি খুন করব?’—শাস্তা আর শাস্তা নেই, হিংস্র রাক্ষসীর মতো এগিয়ে যাচ্ছে সে শ্যামের দিকে।

পরদিন সকালে গ্রামের মাহুযরা আবিষ্কার করল শ্যামের মৃতদেহ। কিন্তু শাস্তা এবং তার ছ’টি ছেলেমেয়ের কোনো সন্ধানই পাওয়া গেল না। কেউ বলতে পারল না তারা কোথায় গেছে। কেউ তাদেরকে দেখেনি আর।

বুড়ো-বুড়ীরা বলা-কওয়া করতে লাগল, ‘আমরা তো জানতামই। ময়েটা কি আর মাহুয ছিল! স্পষ্ট বোঝা যেতো ও মাহুয নয়, যন্ত কিছু। এতোদিন বলিনি ভয়ে, কার কি অমঙ্গল করে বসে!

[লিখেছেন : শেখর চৌধুরী]

খাঁচা ছাড়া আত্মা

সম্পাদক মহাশয়,

আমার এই কাহিনী আপনাকে বিশ্বাস করতে বলি না। আপনি যে বিশ্বাস করবেন সে ভরসাও আমার নেই। আপনি কেন, আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না, করছেন না। মুখের উপর কেউ আমাকে মিথ্যাবাদী বলেন না, তাঁরা শুধু আমার মুখের দিকে নির্ভেজাল করণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন বা কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে অস্ত্র প্রসঙ্গে চলে যান। কিন্তু আমার কথা ষাঁটি সত্য, আমি শপথ করে বলছি। কোনো অপরাধ ঢাকার চেষ্টায় মিথ্যে কথা আমি জীবনে কখনো বলিনি। এখনো বলছি না।

সবটাই বরং আপনার জানা ভালো। বিশ্বাস করা না করা আপনার খুশী। কিন্তু একটা অমরোধ, সম্পাদক মহাশয়। লেখাটা পড়তে শুরু করে শেষ না করে কেলে দেবেন না। দয়া করে সবটা পড়বেন। আর একটা কথা। আমার জীবনের এই ঘটনা আপনাকে আমি জানাচ্ছি, ইচ্ছা করলে আপনি আবার আপনার পাঠক সম্প্রদায়কে জানাতে পারেন। লেখাটা ছাপলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব আপনার প্রতি।

আমার বয়স মাত্র একুশ পুরো হয়ে বাইশে পড়েছে, চেহারা মোটা-মুটি মুন্সী। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ভালো একটা চাকরীও যোগাড় করেছি। তিনমাস আগের ঘটনা। আমি ডায়মণ্ড হারবার রোড ধরে কোলকাতার দিকে আসছি। নিজের গাড়ী চালিয়ে। হাওড়ায় গিয়ে দিল্লী এক্সপ্রেস এ্যাটেণ্ড করতে হবে। আমার বড় সাহেব আছেন ওই গাড়ীতে। সেদিন সকাল থেকে সারাদিন বৃষ্টি পড়ছে, কলে পীচালা রাস্তা বেশ পিচ্ছিল। আমিও সাবধানে গাড়ী চালাচ্ছি।

সেই সন্ধ্যার কথা আমার আজও ঠিক ঠিক স্মরণ আছে। তারপর প্রায় তেরো সপ্তা কেটে গেছে। তবু আমার স্মৃতি ত্রান হয়নি এতটুকু।

বর্ষাকালত আকাশের মেঘ সারে গেছে। আকাশে একাদশী চাঁদ আর কয়েকটি ছোটো ছোটো তারা। উইণ্ডমিলের ভেতর দিয়ে মেঠো হাওয়া গায়ে এসে লাগছে, ছ'পাশের কানে শো শো আওয়াজ করছে। বেশ বাচ্ছি। যেতে যেতে, অপ্রত্যাশিত একটা দৃশ্য দেখলাম।

দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম আমি মেয়েটাকে। আমার গাড়ীর হেডলাইটের উজ্জ্বল আলো মেয়েটার সর্বাঙ্গে গিয়ে পড়ছে। কলে পরি-কার দেখতে পাচ্ছিলাম। মেয়েটাকে দেখা মাত্র অনেকগুলো প্রশ্ন জাগল মনে, স্বভাবতই।

রাস্তার ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। কেও? এতো রাত, চারদিক নির্জন, আশপাশের বাড়ী-ঘরও চোখে পড়ছে না—উদ্দেশ্য কি মেয়েটার? হাত নাড়ছে ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে, ধামাতে অমরোধ করছে গাড়ী।

কি করব, কি করা উচিত তা সহজে ঢুকল না মাথায়। ভেবে কিছু স্থির করার আগেই গাড়ীর গতি স্তব্ধ করলাম। মেয়েটার একেবারে কাছাকাছি এসে গেছি, স্তব্ধতা ব্রেক কষতে হলো। এই নির্জন পথে এমন ঘটনার জন্ত প্রস্তুত ছিলাম না। বাহোক, গাড়ী থামালাম।

গাড়ী থামাতেই মেয়েটি গাড়ীর কাছে দৌড়ে এলো। হাঁপাচ্ছে ভীষণ। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আমাকে যদি একটা লিক্‌ট দেন তো বড় উপকার হয়। এসপ্লানেড পর্যন্ত নয়তো অন্তত খিদিরপুর ব্রিজ। অনেককণ একা এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। একটাও বাস নেই। আমার আবার শিয়ালদা থেকে একটা ট্রেন ধরতে হবে।'

মেয়েটিকে দেখলাম খুবই নার্ভাস। হয়তো ট্রেন ফেল করার ভয়েই। কী করি—আপনি হলে কী করতেন? আমি গাড়ীর দরজাটা খুলে বললাম, 'উঠে আসুন।'

দেবী না করে ছেড়ে দিলাম গাড়ী। মেয়েটি যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিল তখন তার মুখটা আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। কেমন যেন চেনা চেনা মুখ। কোথাও নিশ্চয়ই দেখেছি। কিন্তু কোথায় দেখেছি তা শত চেষ্টা করেও স্মরণ করতে পারছিলাম না। মাথায় বোঝা হয়

ঘোমটা ছিল, ঠিক মনে নাই। টিয়ারিঙ হুইলে হাত আছে, কান আছে তার কথায়। মনে করার চেষ্টা করছি কোথায় দেখছি এই মেয়েকে। অনেক কথা বলছিল সে। বলার ভঙ্গি একটু যেন দ্রুত, কথাগুলোও একটু যেন অসংলগ্ন। কথা কওয়ার সময় বার বার পেছন ফিরে তাকাচ্ছিল যেন ভয়ে ভয়ে—কেউ পেছনে তাড়া করে আসছে! একটু আশ্চর্য মনে হলেও আমি অবশ্য তা নিয়ে তখন মাথা ঘামাইনি।



এমনিতেই দেরী হয়ে গিয়েছিল, তাই গাড়ীটায় স্পীড দিয়েছিলাম একটু বেশী। আমতলা হাটের কাছাকাছি একটা বাঁক পাওয়া গেলে, এমন কিছু শাপ-টার্ণ নয়। পা দিয়ে ব্রেকটা চেপে ছইল ঘোরালাম। কিন্তু পিছলি, ভিজে রাস্তা, যেখানে যা হবার নয় সেখানে তাই ঘটল। সামান্য একটু এগিয়ে গাড়ীটা একেবারে খানায় গিয়ে পড়ল। পড়বার সময় আমি চীৎকার করে উঠেছিলাম, মনে আছে। কিন্তু মেয়েটা যেন

বিলবিল করে হেসে উঠল। অন্তত হাসির মতো একটা শব্দ আমার কানে ঢুকছিল এ কথা আমি হলপ করে বলতে পারি। মনের ভুল? হতেও পারে।

বোধ হয় জ্ঞান হারিয়েছিলাম আমি। সম্ভবত মেয়েটিও। বোধ হয় জ্ঞান হারিয়েছিলাম একজ্ঞ বলছি যে অঁচতত্ত্ব হবার পর অর্থাৎ আধো-চেতন আধো-জাগরণের অবস্থায় একটা স্বপ্ন দেখলাম। যেন কোন নতুন শহরে গিয়ে পথ হারিয়ে কেলেছি। এদিকে খোয়াল আছে নির্দিষ্ট একটা বাড়ীতে ঢুকলে বেঁচে যাবো, নইলে ভীষণ বিপদ। দৌড়াছি, প্রাণপণে দৌড়াছি। নিরাপদ আশ্রয় দরকার আমার। যেমন করেই হোক ঠাঁই খুঁজে নিতে হবে। কিন্তু হায় ভগবান! আশ্রয়ের আর আশা নেই। আমার সামনেই একটা বিদ্যুৎ কালো অন্ধকার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। আমি আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়লাম। এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়ল পাশেই অনেকগুলো বাড়ী। তাড়াতাড়ি একটা বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। ব্যস, এইটুকু স্বপ্ন। এরপর আমি জেগে উঠলাম।

জ্ঞান হতে দেখলাম একটা বড় বড় বোঝাই গরুর গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লেগে আমার গাড়ীখানা উল্টে পড়েছে। গাড়ীর নীচে একজন পড়ে আছে। মৃতদূর মনে পড়ে, সেই মেয়েটির ছিল একটা খয়েরী রঙের শাড়ী আর পায়ে হাওয়াই চপ্পল। আমার গাড়ীর নীচে যে দেহটা চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে তার পরনে কিন্তু ডেকরনের ট্রাউজার, পায়ে অস্কের্ভ সু। ভাবলাম, নিশ্চই গাড়ী উল্টানোর মুখে আর কেউ চাপা পড়েছে। কিন্তু মেয়েটি তাহলে কোথায়? তাছাড়া, ডেকরনের ট্রাউজার আর অস্কের্ভ সু—ওগুলো তো আমার পরনে ছিল।

কেমন যেন বোকা বনে গেলাম। চারদিকে তাকাই বিহ্বল দৃষ্টিতে। এমন সময় আপাধমস্তুক চমকে উঠলাম। একি! লাল পেড়ে খয়েরী শাড়ীটা যে আমারই গায়ে।

কী সর্বনাশ! এমন ঘটল কী করে!

বন বন করে দুরতে গুরু করল মাথা। শুধু যে শাড়ী তা নয়, আমার

সবটাই যে অবিশ্বাস্তরকম পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ভগবান! একি কাণ্ড তোমার! আমি, ভবানী মুখোপাধ্যায়, মেয়ে হয়ে গেছি!

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম সেখানেই—বা ঘটেছে তা হজম করা সম্ভব হচ্ছিল না। কি করব ভেবে টিক করতে পারছিলাম না আমি। কোনো সন্দেহ নেই, পুরুষ নেই আমি আর। পরিপূর্ণ একটা মেয়ে হয়ে গেছি।

খানিক পর নিজেকে বাধ্য করলাম সুস্থ মস্তিষ্কে গোটা ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখতে। প্রশ্ন করলাম নিজে—আমি কে? আমার ভেতর থেকে উত্তর এলো—তুমি ভবানী মুখোপাধ্যায়। প্রশ্ন করলাম—দেহটা কার? উত্তর এলো—শিয়ালদাগামী সেই মেয়েটির।

হুজোর ছাই, নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজে দিচ্ছি—কিছুই এতে প্রমাণ হবে না। প্রশ্ন জাগল, আমি কি সেই মেয়েটির দেহে প্রবেশ করেছি, আমি মানে, আমার আত্মাটা? তাহলে আমি কি সেই মেয়েটির আত্মাশূন্য দেহে প্রবেশ করে আমার আশিষ লোপ করেছি? শুনেছি, আত্মারা অনেক সময় দেহ খাঁচা থেকে মুক্তি পেলে সামনে বার খালি দেহ পায় তার দেহেই ঢুকে পড়ে। আমিও কি, মানে আমার নির্বোধ আত্মাটা কি শেষ পর্যন্ত তাই করে বসেছে?

উঠে দাঁড়লাম। এগিয়ে গিয়ে গাড়ীটা সারাবার চেষ্টা করলাম। শাড়ী পরে কাজ করার ভারী অসুবিধে। অতি কষ্টে গাড়ীর নীচে থেকে আমি আমার মরদেহ উদ্ধার করলাম। যে কোনো সময় নুগু'হীন দেহ বা ছিন্নভিন্ন রক্তমাখা হাত-পা দেখলে আমি হুগু'হাই, সেই আমি আত্ম নিজেই পিণ্ডি পাকানো বিকৃত দেহটা অনেককণ ধরে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখলাম। দেহটা যে আমার তাতে সন্দেহের কোনো কারণ দেখলাম না। আমার দেহ আমার চেয়ে ভালো করে আর কে চেনে। নাকের ওপর তিল, ঐষায় জরুল, ঠা হাতের কবজিতে কাটা দাগ—সবই চিনতে পারছি। অবস্থাটা অস্বাভাবিক। ভাবলাম সেই মেয়েটির আত্মাও হয়তো আমার দেহে ঐধভাবে প্রবেশ করেছে। তাড়াতাড়ি আমার দেহের জ্ঞান সেরাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু না। আমার দেহটায় এক কেঁটা প্রাণ নেই। সেই মেয়েটির আত্মা আমার দেহে প্রবেশ করেনি,

মুক্তি হয়ে গেছে তার।

সমগ্র ঘটনাটা আমার চিন্তা করতে লাগলাম। অচৈতন্য অবস্থায় সেই হৃৎস্পন্দটার কথাও ভাবলাম। হয়তো যে বাড়ীটার চুকতে চাইছিলাম সেটা আমারই দেহ, আর সেই কালোছায়াটা হয়তো আমার মৃত্যু। তারই ভাঙনায় শেষ পর্যন্ত মেয়েটির এই শূন্য দেহে অর্থাৎ কাছাকাছি বাড়ীটায় ঢুকে পড়েছি। বাড়ীর দরজা খোলা ছিল, অর্থাৎ সেই মেয়েটি অ্যান্ড্রিডেট ঘাঁটার সাথে সাথে ভবলীলা সাদা করেছে।

কাণ্ডটা হলো সংক্ষেপে এই। এখন প্রশ্ন, কিভাবে কি করা যায়? বুঝলাম পালাবার পথ নেই। যা হবার নয়, তাই হয়েছে। আমার দেহটা মৃত, সেই আত্মাহীন দেহে প্রবেশের আর আমার উপায় নেই।

আকাশ-পাতাল চিন্তা। মাথার ভেতর লক্ষ-কোটি সমস্তার সৃষ্টি হচ্ছে। ভাবলাম, একটা মেয়ের দেহে প্রবেশ করে বেঁচে না থেকে মরে গেলেও চের ভালো ছিল। মেয়ে হয়ে বেঁচে থাকতে হবে।—ভাবতে গেলেই পাগল হয়ে বাবো বলে মনে হচ্ছে। নতুন করে কথা বলতে হবে, নতুন চিন্তা করতে হবে, শাড়ী স্লাউজ পরে ঘুরতে হবে। বাবা নেই, কিন্তু জননী জীবিত—জীবিত থেকেও মৃত আমার কাছে। তিনি আমাকে চিনতেই পারবেন না, বিশ্বাসই করবেন না আমি তার একমাত্র সন্তান ভবানী।

কোথায় আমার এই নতুন দেহের বাড়ী কে জানে! মেয়েটির হাত ব্যাগ খুঁজলে হয়তো সন্ধান পাওয়া যাবে।

হাত ব্যাগে দেখলাম আশিটা টাকা রয়েছে। এছাড়া হাত ব্যাগের পকেটের ভেতর একটা খাম পাওয়া গেল। খামের ভেতর সংবাদপত্রের কিছু কাটিং সংভ্রম রকিত। একটা কাটিং পড়ে দেখি এক রোমাঞ্চকর হত্যাকাণ্ডের বিবরণ। মাত্র কয়েকটি টাকার জন্য এক ভাইজি তার পিসিকে খুন করে পালিয়েছে! মেয়েটি গা ঢাকা দিয়ে আছে, পুলিশ তাকে খুঁজছে। সেই সঙ্গে আর এক হুকরো কাগজ। তাতে একটি নোটিশ ছাপা হয়েছে। নিরুদ্দিষ্ট এই হত্যাকারীণীকে ধরিয়ে দিতে পারলে নগদ এক হাজার টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।

আচমকা একটা কণ্ঠর শব্দে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল ভয়ে। কে

যেন জলদগন্তীর স্বরে বলে উঠল, 'কেমন আছেন, মিস হাজরা?'

ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম, 'সে আবার কে? হাজরা কে আবার?'

'ন্যাকামী হচ্ছে, না? হাজরা কে জানেন না? হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাঃ! হাসালেন দেখছি আপনি আমাকে মিস হাজরা। ভেবেছেন ঢালাকী করে নিকৃতি পাবেন আমার হাত থেকে? ওটি হচ্ছে না, ছাড়া পাচ্ছেন না আপনি আমার কবল থেকে। হাজরা আবার কে—বেশ কথা বলেছেন মাইরি! তা একটু পরই জানতে পারবেন। ক'টা টাকার লোভে বৃত্তী-টাকে গলা টিপে মারলেন, একটুও হাত কাঁপলো না?'

'কী বলছেন এসব আপনি? কে আপনি?'

'অনেকক্ষণ থেকেই পিছু নিয়েছি। আমি বনমালী চক্রবর্তী, সামান্য পুলিশ ইন্সপেক্টর মাত্র। ভঙ্গলোকটিকেও দেখছি মেরেছেন। ওর কতো টাকা হাতালেন?'

'পুলিশ!'

'আলবত পুলিশ! চলুন, মিস হাজরা, থানার যাওয়া যাক।'

সম্পাদক মশাই! বনমালী চক্রবর্তী বোঝেনি। থানার বড় দারোগা-কেও কিছু বোঝাতে পারিনি। হাইকোর্টে কেস গিয়েছিল, আদালতের জুরিরাও আমার কথা বিশ্বাস করেনি। দিল্লীতে খবরাখবর হয়েছে। শুনেছি তারাও আমাকে পাগল বলে ধরে নিয়েছে।

এই জেলখানার ওয়ার্ডার, জমাদাররাও কিছু শুনতে চায় না। হয়তো কাল সকালে যে বেটা ক'সির দড়ি হাতে করে আসবে সেও কিছু বিশ্বাস করবে না।

সম্পাদক মশাই! আপনি বিবেচক ব্যক্তি, আপনার পাঠক-পাঠিকারাও বুদ্ধিমান। তবু আপনারাও যে আমার কথা বিশ্বাস করবেন সেই ভরসা আমার আর নেই। প্রমাণের অভাবে এরা আমাকে ক'সিতে লটকাতে যাচ্ছে। প্রমাণ নেই, এক কথা সত্যি। প্রমাণ দেখাব কি করে বলুন?

মরতে আমাকে হবেই। সেজন্য আশঙ্কা নেই। কিন্তু দুঃখ এই যে কেউ আমার কথা বিশ্বাস করলো না!

[লিখেছেন : অসীম রায়]

জ্ঞানাব মঞ্জিল

হাসপাতাল থেকে বের হয়েই মুশকিলে পড়ে গেলাম। চারদিক ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এদেশের বিখ্যাত আঁধি।

হাসপাতাল থেকে স্টেশন মাইল তিনেকের কম নয়। কিন্তু এই অন্ধকারে যখন হ'হাত দুয়ের বস্ত্র দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না, তখন টাঙ্গা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।

হাসপাতালে আশ্রয় নেব তাও সম্ভব নয়। ছটায় গেট বন্ধ।

কোনো রকমে পথ হাতড়ে হাতড়ে এগোতে লাগলাম। যদি কোথাও কোনো আশ্রয় পাই।

হাতে ওঘুঘের নমনীয়তা ব্যাণ। জীবিকা মেডিকেল রিএজেন্টেটের। পথেই বাস। ডাক্তারখানা আর হাসপাতালে ঘুরে বেড়াতে হয়।

সোনায় সোহাগ। কনকনে বাতাস শুরু হল। মনে হল ধারে কাছে কোথাও বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। বৃষ্টি এখানে এলেই হৃদয় আর একশেষ।

বেশ কয়েকবার হেঁচট খেলাম। পাথরে ঠোকর, গাছের টুকরো ডাল এসে কপালে লাগল।

ঘন অন্ধকারে সাদা মতন কি একটা বস্তু দেখা গেল।

খুব কাছে গিয়ে দেখলাম, একটা গেট।

প্রায় জরাজীর্ণ।

পা দিয়ে অল্পভব করে বুঝলাম, ছোট ছোট হুড়ি বিছানো।

লক্ষ্যে শহরে বহু রহিস আদমির পরিত্যক্ত আবাস আছে। যত্নের অভাবে ভগ্নপ্রায়।

পাথরের ওপর দিয়ে এগোতেই একটা বাড়ী নজরে এল।

ও—ভৌতিক গল্প—২

একতলা বাড়ী, কিন্তু গড়ন দেখে মনে হয় এক সময় খুব মজবুত
আর সুদৃশ্য ছিল। যুগল ধাম লতাপাতার নক্সা আঁকা।

দরজা বন্ধ। ভারি পাল্লার দরজা।

ছুটে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলাম। ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল।

দেখলাম, ছিন্ন মূলিমলিন কার্পেট। চারদিকে কিংখাবের তাকিয়া।

তাদের অবস্থাও খুব খারাপ।

বাইরের অন্ধকার বোধ হয় কিঞ্চিৎ তরল হয়ে এসেছে, তাই
ঘরের অভ্যন্তরের সবকিছু একটু একটু দেখা যাচ্ছে।

খুব রাস্তা লাগছে। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না।

একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লাম—ব্যাগটা জড়িয়ে ধরে।
বিকালে পেটে পড়েছে শুধু চা আর শীর্ণদেহ ছুটি পাউরুটির ইকরো।
ভেবেছিলাম ষ্টেশনে গিয়ে পেট পুরে রাতের খাবার খেয়ে নেব, কিন্তু
বিধি বাদ সাধল।

এ ছর্ষণে কখন ধামবে ঈশ্বর জানেন।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে টের পেলাম ভারি পাল্লার দরজাটা এক সময়
বন্ধ হয়ে গেছে, তাই বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস আর ভেতরে আসছে
না।

নুপুরের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

চোখ খুলে দেখলাম, কোলানো বাতিদানে অজস্র বাতি। দেয়ালে
কম্পমান একটা ছায়া।

উঠে বসলাম। প্রথমে ভাবলাম, স্বপ্ন ছাড়া আর কি!

কিন্তু না, বারবার হুহাতে চোখ মুছেও সামনের দৃশ্য মুহুতে পারলাম
না।

অনিশ্চয়তায় এক নর্তকী। বৃকে কাঁচলি। পরনে ঘাগড়া, মাচের
তালে তালে জরি বাঁধা বিহুনি ছিলছে।

সারেসদীর আওয়াজ। ভবলার বোল।

চোখ ফিরিয়ে দেখলাম সবুজ তাকিয়া চেস দিয়ে বসে আছেন এক
বৃদ্ধ। মাথার চুলে-দাড়িতে কমলা রংয়ের কলপ।



www.banglabookpdf.blogspot.com

দৃষ্টিতে কলুষ কামনার ছাপ। পলকহীন চোখ নর্তকীর যৌবন ভরিপ
করছে।

বৃদ্ধের সামনে খেত পাথরের রেকাবিতে শুপীকৃত বেলফুল।

দেয়ালে হেলান দিয়ে বসলাম।

একটু পরে নাচ ধামল।

সারেসদীবাদক আর ভবলচী সেলাম করে বিদায় নিল।

নর্তকী এগিয়ে এসে একেবারে বৃদ্ধের কোলের কাছে বসল। বৃদ্ধ

আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'কুলসুম!'

'হুজুর!' www.banglabookpdf.blogspot.com

'তুমি যে আবার আমার নাচের আসরে আসবে তা আমি ভাবতেও

পারিনি।'

'আমি কি না এসে পারি হুজুর?'

'ছবার কৈজাবাদে তোমাকে খবর পাঠিয়েছিলাম। তুমি ছিলে না।'

'না হুজুর, আমি মুজরোর গোয়ালির গিয়েছিলাম। ফিরে এসে খবর
পেয়েই চলে এসেছি।'

'আজ আমার ভগ্নদশা কুলসুম। তোমাকে নজরানা দেবার সার্বথা
আমার নেই। এই ভাঙা মঞ্জিলে মৃত্যুর অপেক্ষা করছি।'

'ওভাবে কথা বলবেন না হুজুর। আপনার সঙ্গে যে আমার টাকা-
পরসার সম্পর্ক নয়, তাতো আপনি ভালোই জানেন।'

'কিন্তু আমাদের মুহুরতের সম্পর্ক—এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে?'

'কে কি বিশ্বাস করবে তা নিয়ে আমার একটুও মাথা ব্যথা নেই।
আমি চিরদিন আপনার বাদী।'

'পিয়ারী কুলসুম!'

বৃদ্ধ নর্তকীকে বুকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই বিপর্যয়।

দ্রুম করে শব্দ।

খাসের আড়ালে খোঁয়ার কুণ্ডলী।

নর্তকী চীৎকার করে বৃদ্ধের পায়ের কাছে পড়ে গেল।

একি হল, কোন দৃশ্যমন এমন কাজ করলো!

বৃদ্ধ নীচু হয়ে কম্পমান হাতে নর্তকীর কাঁচুলি খুলে ফেলল।

ছটি স্বর্ণাভ পয়োধর। তার মাঝখানে রক্তের ধারা।

'এই কে আছিল? হাকিম সাহেবকে একবার ডাক।'

বৃদ্ধের ভীত কণ্ঠের প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এলো, 'কেউ সাড়া দিল না।

নর্তকী ক্রমে নিজীব হয়ে পড়ল।

বৃদ্ধ প্রথগতিতে বোধ হয় অন্তঃপুরের দিকে গেল। কিন্তু বেশী দূর
যেতে পারল না। আবার শব্দ।

'ইয়া আল্লা বলে শব্দ করে মেঝের ওপর পড়ে গেল বৃদ্ধ।'

একটা ছায়া নিঃশব্দে সরে গেল।

www.banglabookpdf.blogspot.com

আমার অবস্থা কাহিল। ক্ষুধার্ত দেহ এমনিতেই অবসন্ন ছিল, সামনে
ছটি হত্যাকাণ্ড দেখে শরীরের রক্ত শীতল হয়ে গেল।

একবার ভাবলাম এইবেলা এখান থেকে পালাই। বাইরে হয়ত
এতকণ্ঠে আমি পরিষ্কার হয়ে গেছে। পথ চলতে কোনো অসুবিধে হবে না।

উঠতে গিয়েই থেমে গেলাম।

বাইরে মোটরের শব্দ। সিঁড়িতে ভারী বুটের আওয়াজ।

একজন ইন্সপেক্টর, সঙ্গে ছজন পুলিশ। একেবারে পেছনে কামিজ

পাজামা পরা একজন লোক—ভৃত্য শ্রেণীর বলেই মনে হল।

'এই দেখুন হুজুর, কুলসুমের লাশ।'

কুলসুম চিৎ হয়ে পড়ে আছে। উল্লসে কিছু নেই! সমুদ্রত

ন্তন। ছটি স্তনের মাঝখানে শোণিতের গাঢ় কালো রেখা।

ইন্সপেক্টর হাই মুড়ে বসে পরীক্ষা করল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে
বলল, 'জনাবের দেহ কই?'

'ওই যে হুজুরে আলা, সিঁড়ির ওপর। খাসের পাশে।'

ইন্সপেক্টর এগিয়ে গেল।

বৃদ্ধের মৃতদেহ পরীক্ষা করে জানতে চাইল, 'এ বাড়ীতে কে কে
শায়ে?'

'জনাব আর আমি, হুজুর।'

'তাহলে গুলি করল কে?'

'তাতে জানিনে হুজুর। আমি রসুইখানায় ছিলাম। পর পর ছ'

বার বন্দুকের শব্দ শুনে—রত্নইখানা থেকেই উৎকি দিয়ে দেখলাম এই কাণ্ড। আমি আর এদিকে আসিনি। কোতোয়ালীতে খবর দিতে ছুটেছিলাম।’

‘তাহলে তো তোমাকে গ্রেফতার করতে হয় মনসুর!’

মনসুর ভীত বিহ্বল কণ্ঠে বলল, ‘আমাকে? আমি বন্দুক কোথায় পাবো হুজুর? তাছাড়া জনাবকে আমি কেন গুলি করতে যাব, যদিও এই বাইজী মেয়েটি আমার ছ’চোখের বিষ।’

‘তাহলে আসমান থেকে গুলি এল?’

ইলপেস্তর এদিক ওদিক চোখ কিরাতেই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। বাইরের লোক তো আমিই রয়েছি। যদিও আমার কাছে বন্দুক নেই কিন্তু হত্যাকাণ্ডের পর কোন আসামীই নিজের কাছে হাতিয়ার রেখে দেয় না।

নীচু হয়ে একটা থামের আড়ালে আত্মগোপন করে রইলাম।

ভাগ্য ভালো আমার দিকে ইলপেস্তরের নজর পড়ল না।

‘কুলসুম কতদিন এই মঞ্জিলে রয়েছে?’

‘আজ বিকেলে এসেছে হুজুর। কৈজাবাদ থেকে টানা মোটরে। এক রহিস আদমি নামিয়ে দিয়ে গেছে।’

‘তোমার মনিবের বাইজী পোষার মতন টাকা-কড়ি আছে এখনও? আমরা তো জানি কিছুই নেই। যৌবন কাল থেকে ছ’হাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সব নষ্ট করেছে।’

‘কিছুই নেই হুজুর। আপনারা ঠিকই জানেন। এ পরস্যা-কড়ির ব্যাপার নয়।’

‘তবে?’

‘মহব্বতের ব্যাপার।’

‘মহব্বত? একটা বুড়োর সাথে নওজোয়ানীর মহব্বত?’

‘হ্যাঁ, হুজুর। আজ দশ বছর ধরে। কুলসুমের বয়স যখন ষোল তখন থেকে।’

ইলপেস্তর হাতের ছড়িটা নিজের প্যাঞ্চে আছড়ান।

‘তাজব কি বাত! ব্যাপারটা কি?’

‘ব্যাপার জানিয়ে হুজুর। শুনেছি দুভিকের সময় একটা গাছের নীচে জনাব কুলসুমকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। কেউ বোধ হয় কেলে দিয়েছিল। নিজের বাড়ীতে আগুৱাত কেউ না থাকায় কানপুরে বোনের কাছে দিয়েছিল মানুষ করতে। তারপর জনাবের আর খেয়াল ছিল না। শিকার আর শরাবের নেশায় ডুবে ছিলেন। বেশ কয়েক বছর পর খবর পেলেন বোনের বাড়ী থেকে কুলসুম পালিয়েছে। বোধ হয় কারো হাতছানিতে। জনাব কিন্তু কথাটা বিশ্বাস করেননি। আমাকে বলেছিলেন, ‘সব বাজে কথা মনসুর! আমার বোনকে তো আমি চিনি। নিশ্চয় পরসার লোভে কুলসুমকে কারো কাছে বিক্রি করে দিয়েছে।’

তার বছর ছয়েক পর কুলসুম এসেছিল!

আমি তখন জনাবের পাশে বসে পা টিপে দিছি। বিশ্বাস করুন হুজুর, আমার মনে হল বেহেশত থেকে পরী এসে দাঁড়াল। মাহুষের দেহে এত রূপ হয়, হতে পারে, আমার তো জানা ছিল না।

জনাব প্রশ্ন করলেন, ‘কে?’

‘আমি কুলসুম।’

‘কুলসুম? কুলসুম কে?’

‘জনাব স্মৃতি হাতড়েও কিছু পেলেন না।’

‘চিনতে পারলেন না হুজুর? এ নাম তো আপনারই দেয়া। এ দেহ গাছতলা থেকে আপনিই তুলে নিয়েছিলেন।’

‘ও কুলসুম তুমি? এতদিন পরে তুমি এলে?’

‘আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে। সেদিন কেন আমার বাঁচিয়েছিলেন হুজুর? যদি দেহই বাঁচিয়েছিলেন, তবে সে দেহ পবিত্র রাখার ভার নেননি কেন?’

‘পবিত্র রাখার ভার? কিন্তু তুমি তো খেঁজার আমার বোনের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।’

‘হ্যাঁ, গিয়েছিলাম, কারণ এছাড়া আমার অত্ন কোনো পথ ছিল না। আপনার বোন আমাকে দিয়ে ব্যবসা করতে চেয়েছিলেন। তাই পালিয়েছিলাম। কিন্তু পালিয়েও নিজেকে বাঁচাতে পারিনি হুজুর।

মেয়েদের দেহই তাদের বড় শত্রু। আর একজনের হাতে পড়লাম।’

অনেক চেষ্টা করেও নিজেকে রক্ষা করতে পারলাম না। আজ আমি বাঙ্গালী ছড়। নজরানা নিয়ে গান গাই, নাচি, দেহও বিক্রি করি।

‘তুমি এখানে থাক কুলসুম। আমার কাছে।’

কুলসুম রয়ে গেল।

আমি জনাবের কাছে অনেকদিন রয়েছি। তাঁর খাত আমার খুব চেনা। আমি দেখতাম যখনই কুলসুম কাছে এসে বসত, জনাবের চোখের কোণে রক্ত জমত। তার মানে আমি বুঝি। তার মানে দেহের ভুকা। উজ্জল যৌবনকে ভোগ করার স্পৃহা।

‘হু, তারপর?’

‘সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, মেয়েটাও মজল। জনাবের দেহে যেন নতুন যৌবন ফিরে এল। ওদের ব্যাপার দেখে আমারই লজ্জা করত। কুলসুম কিন্তু থাকল না। কুলসুমকে তবিরত করার, খাওয়াবার সামর্থ্য জনাবের ছিল না। কুলসুম চলে যেত, ঢাকা-পরদা রোজিগার করে আবার ফিরে আসত।’

‘তাই।’

‘তাহলে মনে হচ্ছে কুলসুমের কোনো বাবুই বোধ হয় এ কাজ করেছে। প্রতিশোধ নিয়েছে।’

ইলপেট্টর কিছুকণি কি ভাবল তারপর সঙ্গের পুলিশ হুঁজনকে বলল, ‘এই লাশ উঠিয়ে নিয়ে চল।’

তারপর মনস্থিরের দিকে ফিরে বলল, ‘তুমি এ মঞ্জিল ছেড়ে কোথাও যাবে না। বাইরে পুলিশ মোতায়েন করে রাখলাম। পালাবার চেষ্টা করলে মুশকিলে পড়বে।’

এতো হুঃখ, এতো ভয়ের মধ্যেও কৌতুক অনুভব করলাম। এক জাঁদরের পুলিশ কুলসুমের যৌবন পুষিত অনিন্দিত দেহ কাঁখে তুলে নিল। আর একজন পুলিশ জনাবের দেহ তুলে নিয়ে গেল।

আমি নিজীবের মতো বসে রইলাম। সব অনুভূতির উচ্ছেদ।

পুলিশরা বোধ হয় বাইরের দরজা খুলে রেখে গেছে। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস।

ঠিক করলাম, আরো পুলিশী হান্ধাম হবার আগেই পাליয়ে যা।

যথেষ্ট শীতবস্ত্র সঙ্গে নেই, কিন্তু প্রাণের দাম এ সবকিছুর চেয়ে বেশী।

ব্যাগ হাতে উঠাতে গিয়েই থমকে গেলাম।

মনে পড়ে গেল, গেটে পুলিশ মোতায়েন আছে।

আমি বাইরে যাবার চেষ্টা করলেই ধরা পড়ব।

খুট শব্দ হতেই চোখ ফেরালাম।

অদ্ভুত দৃশ্য।

মনস্থর সিঁড়ির ধাপে রয়েছে। হাতে একটা বন্দুক।

ছোটো চোখ লাল টকটকে। গালের মাংসপেশী খরখরিয়ে কাঁপছে।

‘হ্যাঁ, আমি খুন করেছি। বেশ করেছি। কুলসুম আমাকে ভালো-

বাসেনি? বলেনি আমি তার আসল লক্ষ্য? বুড়ো উপলক্ষ্য মাত্র।

এখন বুঝতে পারছি, দিনের পর দিন আমার সঙ্গে ছলনার অভিনয় করেছে।

সারা মঞ্জিল ঘুমিয়ে পড়লে নিঃশব্দ চরণে আমার কাছে এসেছে প্রতি-
রাতে।

তারপর আসা বন্ধ করেছে।

একদিন আড়ালে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি হল, আর আস না যে?

কুলসুম দৃষ্টিতে অবজ্ঞা আর ঊদাসীন্য ফুটিয়ে বলে, এখন আমার দর-
অনেক বেশী। নজরানা একশ আশরকি। নোকরের এ নজরানা দেবার
সাধ্য নেই।

নোকরের নেই, মনিবেরই কি আছে? তবে দিনের পর দিন, রাতের
পর রাত জনাবের কাছে কেন পড়ে থাকতে? দৈহিক সুখ, মানসিক
ভুগ্নি—কোনটা তুমি পেতে?

এ ছাড়া আমার আর কোনো পথ ছিল না। হুঁজনকেই ছিনিয়া
খেকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হলাম।

আমি এবার মনস্থির করে ফেললাম।

কোনারকমে গেটের কাছে গিয়ে পুলিশকে খবর দিই। বন্দুক
সহ আসামী মজুত। তাহলেই সমস্যার সমাধান হবে।

উঠতে গিয়েও পারলাম না।

ছটি চোখ ঘুমে বুজে আসছে। শরীরের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে অবসাদ।
আবার শুয়ে পড়লাম।

খুনী ধরার দায়িত্ব আমার নয়। আমি বিদেশী। শেষকালে কোন
বিপদের জালে জড়িয়ে পড়ব।

চোখ বন্ধ করতে গিরেই চমকে উঠলাম।

আবার বাইরে অনেকগুলো বুটের আওয়াজ।

প্রথমে ইন্সপেক্টর, তারপর নীল স্মুটপরা এক ভদ্রলোক—তার
হাতে চামড়ার দড়িতে বাঁধা বিরাট আকৃতির একটা অ্যালসেসিয়ান।

অ্যালসেসিয়ানই যেন লোকটাকে টেনে নিয়ে আসছে।

ইন্সপেক্টর হাত দিয়ে দেখাল—যেখানে কুলস্থলের কয়েক কোঁটা
রক্ত পড়েছিল সেই জায়গাটা।

অ্যালসেসিয়ান রক্তের গন্ধ শুঁকেই উত্তাল হয়ে উঠল।

বাঁধন ছেঁড়ার নেশায় ছুঁবার।

ভদ্রলোক নীচ হয়ে বাঁধন খুলে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে অ্যালসেসিয়ান ভীরবেগে ভেতরের দিকে ছুটল। ভেতরে
যেতে গিয়েও সিঁড়ির ধাপের কাছে আবার থামল। এখানেও কয়েক
কোঁটা রক্ত।

সে রক্তও শুঁকল, তারপর সিঁড়ি দিয়ে সজোরে লাফ দিল।

উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসলাম।

বুঝতে পারলাম এখনই অ্যালসেসিয়ান লাফ দিয়ে মনস্থরের ইঁট
কামড়ে ধরে তাকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে আসবে। ছোড়া
খুনের আসামী।

কিন্তু না, অ্যালসেসিয়ান বাইরে এসে আবার চক্কা করে ঘুরতে
লাগল—একটা থাম বেটন করে।

তার মার্বেলের মতো নীল চোখ দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। জিত
ঝুলে পড়েছে। বিরাড়ের মতো কিংগণ্ডি।

অ্যালসেসিয়ানের ভীষণত্ব আমার দিকে। ভয়ে সমস্ত গা কাঁটা
দিয়ে উঠল। হঠাৎ যদি আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে?

এই বিদেশে, সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় কি করব? কি করে নিষেধ
নির্দোষিতা প্রমাণ করব?

যে কোনো খুনের একটা উদ্দেশ্য থাকে। এই বাইজী আর বুদ্ধকে
হত্যা করার পেছনে আমার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

আমি তো মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। অফিসের কাছে লক্ষ্য এসেছি।
বেলব হাসপাতালে আর ডাক্তারদের কাছে গেছি তারাই এর প্রমাণ
দেবে।

কিন্তু এসব তো পরের কথা। উপস্থিত ছর্ভোগের হাত থেকে
আমি কিতাবে পরিত্রাণ পাবো?

বুঝতে পারলাম, এই ঠাণ্ডা আবহাওয়াতেও ঘামে আমার সর্বশরীর
ভিজ়ে গেছে। কি কুক্ষেণে যে লক্ষ্যেই পা দিয়েছিলাম।

কিন্তু না, অ্যালসেসিয়ান আমার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল।
দ্রুতপায়ে থামের চারদিকে ঘুরতে লাগল। তারপর পায়ের নখ দিয়ে
থামটা আঁচড়াতে আরম্ভ করল।

ইন্সপেক্টরের সঙ্গে যে লোকটা এসেছিল, সে বলল, 'কি ব্যাপার, লুসি
এমন করছে কেন?'

লোকটা এগিয়ে এসে থামটা মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করল। ইন্স
পেক্টরের দিকে চেয়ে বলল, 'একটা হাতুড়ি পাওয়া যাবে?'

ইন্সপেক্টর মনস্থরকে বলল, 'এই একটা হাতুড়ি নিয়ে এস তো।'

'হাতুড়ি? হাতুড়ি কোথায় পাবো ছড়?'

'কয়লা ভাঙে কি দিয়ে?'

'ইট দিয়ে। কয়লা ভাঙার রোজ দরকারই হয় না। প্রায়ই তো
হোটেল থেকে খানা আসে।'

ইন্সপেক্টর বলল, 'ঠিক আছে।' আমি দেখছি।'

সে একটু পরই হাতে মোটর উঁচু করার জ্যাক নিয়ে ফিরে এল।

জ্যাকটা দিয়ে ভদ্রলোক আন্তে আন্তে থামের গায়ে ঠুকতে লাগল।
কিছুক্ষণ চোঁকার পরই থামের গায়ে একটা কাটল দেখা গেল। কাটলে

চাপ দিভেই ছোটো দরজার মতো সেটা খুলে গেল।
ভদ্রলোক কাটিলের ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা বন্দুক বের করে আনল।

‘এটা কার বন্দুক?’

স্পষ্ট দেখলাম মনসুরের মুখ পাণ্ড হয়ে গেছে।

ক’পা গলায় উত্তর দিল, ‘জনাবের।’

‘জনাবের বন্দুক এখানে কেন?’

‘জানি না ছজুর।’

ইসপেক্টর বন্দুক খুলে পরীক্ষা করল, তারপর বলল, ‘নল দেখে বোকা যাচ্ছে, এই বন্দুক থেকেই কিছু আগে গুলি ছোঁড়া হয়েছিল। কে ছুঁড়তে পারে?’

মনসুর বলল, ‘আমার মনে হচ্ছে ছজুর, জনাবই কুলসুমকে গুলি করে তারপর নিজে আত্মহত্যা করেছেন।’

ভজলোক একবার মনসুরের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দেখল, তারপর বলল, ‘নিজেকে গুলি করে তোমার জনাব আবার এই খামের কাটলে বন্দুকটা শূন্য হয়ে রেখেছে? তুমি যা ইচ্ছে তাই বোঝাচ্ছ। জনাবের মাথায় গুলি লেগেছে। তার মানে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু। বন্দুক খামের ভেতরে লুকাবার তার শক্তিও ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না।

ইসপেক্টর আর ভজলোকটি যখন বন্দুক পূর্ববক্ষণে ব্যস্ত, তখন হঠাৎ অ্যালসেসিয়ানের বিকট আওয়াজ শোনা গেল।

আমি চমকে মুখ ফেরালাম। অ্যালসেসিয়ান মনসুরের একটা হাত কামড়ে ধরেছে।

মনসুরের করুণ কণ্ঠ, ‘বাঁচান ছজুর, বাঁচান! এ ইবলিশের বাচ্চা আমাকে শেষ করে দিল।’

ইসপেক্টর এগিয়ে এসে মনসুরের হ’হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল। বলল, ‘চল কাটকে। সেখানে তোমার যা বলবার শুনব।’

আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলালাম। কেবল একটা কথা মনে হতে লাগল, এ রাত কি অনন্ত? কিছুতেই শেষ হবে না?

রাত শেষ হলেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ব। উঁকি দিয়ে দেখলাম, কয়েকটা নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে। শীতের কনকনে বাতাস তখনও রয়েছে।

তাকিয়ার উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম। শোবার সঙ্গেই নিদ্রা।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল।

নুপুরের শব্দ। সারেকীর আওয়াজ।

হ’হাতে চোখ মুছে উঠে বসলাম।

একি সম্ভব? আমার চোখ কি আমার সঙ্গে প্রতারণা করছে?

সেই একই দৃশ্য।

অপূর্ব ছন্দে কুলসুম নেচে চলেছে—সারেকীর তালে তালে।

জনাব তাকিয়ার চেস দিয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে নাচের তারিফ করছেন।

এ কি করে সম্ভব?

কোন দৃশ্য ঠিক? আগের না পরের?

চোখের সামনে যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড দেখলাম, তারপরেও এ নৃত্য কি করে সম্ভব হতে পারে?

আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

পকেট থেকে রুমাল বের করে ছোটো চোখ ভালো করে মুছে নিলাম।

না, সেই একই দৃশ্য।

বেশীক্ষণ চোখ খুলে রাখতে পারলাম না। ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল।

নুপুর আর সারেকীর শব্দ ক্রমে দূরগত মূহ’নার মতো মনে হল।

কয়েকজন লোকের চাঁৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। সকাল হয়েছে। চড়া রোদে সবকিছু স্পষ্ট, উজ্জ্বল।

‘সাহাব! সাহাব!’

চোখ খুলে দেখলাম কয়েকজন লোক আমার দিকে ঝুঁকে রয়েছে। তাদের সাজ-পোশাকে ঝাড়ুওয়ালা বলেই মনে হল।

উঠে বসলাম।

জরাজীর্ণ বাড়ী। অনেক জায়গা ধসে পড়েছে। দেয়ালের ক’কে ক’কে বট অখণ্ডের চারা। ওপর দিকে দেখলাম, অব্যবহিত আকাশ।

এখানে কি করে এলাম?

তাকিয়া রেই—পুরনো কাপেট। কুলসুম, জনাব, মনসুর—সব উধাও।

‘আমি কোথায়?’

আমার প্রশ্ন শুনে লোকগুলো পরস্পরের দিকে তাকাল।

একজন বলল, এখানে এলেন কি করে? লক্সোয়ের লোক ভুলেও এদিকটা মাড়ায় না।

‘কেন?’

‘এ জনাব সায়েবের কোঠা।’

‘জনাব সায়েব? যে জনাব সায়েবকে তার চাকর মনসুর গুলি করে মেরেছে?’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেটা আপনি জানলেন কি করে?’

‘কাল রাতে আমি যে দেখলাম নিজের চোখে।’

আমার কথা শুনে লোকগুলো কিস কিস করে নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করল। একটা শব্দ আমার কানে এল—‘বাউরা।’

বাউরা মানে তো পাগল।

এরা কি আমার পাগল সাব্যস্ত করল?

‘কেন, বাউরা কেন? আমি সব দেখেছি। মনসুর জোড়া খুন করেছে—জনাব আর বাঈজী কুলসুমকে।’

একজন আমার খুব কাছে এসে আমাকে নিরীক্ষণ করল। বোধ হয় পরীক্ষা করল শরাবের ঘোরে আমি কথা বলছি কিনা।

তারপর বলল, ‘উঠুন সাহাব! নিজের চোখে দেখুন।’

উঠলাম।

ভাড়া পাথর ডিঙিয়ে পেছন দিকে এলাম। সবুজ উঠান। উঠানের মাঝখানে পাশাপাশি ছুঁতো কবর।

কবরের মাথায় উছ'তে কি সব লেখা।

লোকটাই বলল, ‘এই দেখুন, এটা জনাব সায়েবের কবর। লেখা রয়েছে, জনাব গিয়াসুদ্দীন রিজভী। জন্ম—আঠারো শো চুয়ান্ন। মৃত্যু—উনিশ শো চব্বিশ। আর এপাশে দেখুন, কুলসুম বাইয়ের কবর। জন্ম—জানা নেই। মৃত্যু উনিশশো চব্বিশ।’

বিস্মিত হলাম, তাহলে আমি কি দেখলাম?

একজন ফিসফিস করে একটা কথা বলল, ‘খোয়াব।’

আর একজন বৃদ্ধ মৌলভী, ভিড় দেবে কাছে সরে এসে দাঁড়িয়ে-

ছিলেন, তিনি বললেন, ‘না, না, খোয়াব নয়। এরকম গাণ্ডার আগেও ঘটেছে। আমরা আশা মানি না। কিন্তু এ ঘটনা গাণ্ডার করার মতো বুদ্ধিও রাখি না। সাহাব, আপনি খুব বেঁচেছেন বশতে হয়।’

উত্তর দিতে গিয়ে চমকে উঠলাম।

আমার কানে নুপুরের স্বর ভেসে এল। সারেসারী স্বর!

[লিখেছেন : হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়]

শতাব্দীর ওপার থেকে

হুগলি জেলা সম্পর্কে; একটি প্রাচীন কাব্যে, এই রকম উল্লেখ আছে—‘গঙ্গার পশ্চিম কূল—বানারসী সমতুল।’

কাব্যের উক্তিতে কতোখানি স্থান মাহাত্ম্যের কথা বলতে চাওয়া হয়েছে, জানি না, তবে হুগলির প্রাচীনত্ব বিষয়ে, সংশয়ের কোনো কারণ নেই। কবি যদি এক্ষেত্রে, ত্রিবেণীর কথা মনে রেখে বলে থাকেন, তা হলে আলাদা। কিন্তু আদি সপ্তগ্রাম, যা একদা মুসলমান যুগেরও আগে, অতি সম্পন্ন স্থান ছিল, তার কথাও মনে রাখা দরকার।

কিন্তু ইতিহাস আমাদের আলাচ্য বিষয় নয়। যদিও এক সময়ে, ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই, আমি হুগলি জেলার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছি। সেই ঘুরে বেড়ানোর কাজটা খুব সহজ ছিল না। শহরে বন্দরে ঘোরা-ঘুরির অনেক সুবিধে। গকেটে টাকা থাকলে, সেখানে পাছশালায় বাস্তব আর আশ্রয়ের অভাব হয় না।

পাছশালা বলতে আমি হোটেল রেস্টোরাঁর কথাই বোঝাচ্ছি।

প্রায় বছর পনের আগে, কলকাতার বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তির বাড়ীতে, আমি একজনদের সাক্ষাৎ পাই যার একটি বিশেষ নেশা ছিল প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ করা। সেই বিশেষ স্বভাবাজন পণ্ডিত ব্যক্তির বাড়ীতে, এই মুদ্রা সংগ্রহকারী ভদ্রলোকের সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হয়, তখন তার কাছে আমি একটি লক্ষণ সেন আমলের স্বর্ণমুদ্রা দেখতে পাই। তিনি আমাদের কাছে অকপটেই স্বীকার করেন, মুদ্রাটি তিনি মহানাদ গ্রামের গঙ্গার ধার থেকে কপিং ঘুরে, একটি পোড়ো ভিটার ধূলা থেকে আবিষ্কার করেন। ভদ্রলোকের এই রকম আরো কিছু সংগ্রহ আমি দেখেছি, অধিকাংশই গোঁড়ের পাঠান আমলের মুদ্রা।

ভদ্রলোকের নাম প্রাণনিধি বন্দ্যোপাধ্যায়। আজকাল সচরাচর এই

শতাব্দীর ওপার থেকে

৭৭

রকম বড় একটা দেখা যায় না। প্রাণনিধিবাবুকে আমি প্রথমে নিতাম একজন মুদ্রা সংগ্রহের নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি বলেই মনে করেছিলাম। কিন্তু তার সঙ্গে কিছু আলাপ-আলোচনার পরেই বুঝতে পেরেছিলাম, তিনিও একজন পণ্ডিত ইতিহাসবেত্তা ব্যক্তি। এমনি সাধারণভাবে, তাঁর সঙ্গে আলাপ জমানো খুবই কঠিন। কথা বলতে বলতে তিনি হঠাৎ চুপ করে যান, দীর্ঘসময় অশ্রমক হয়ে থাকেন এবং ঘন ঘন নজি তানেন। তার আচরণের মধ্যে আরো কিছু কিছু ব্যাপার আছে, যার থেকে মনে হয়, তিনি কিছুটা ছিটক্স লোক। যদিও তিনি আদৌ তা নন। আসলে তার চিন্তার গভীরে, নানা বহমান অন্তঃপ্রাণের জটিলতাই এর কারণ, মনে মনেই তিনি যার জট খুলতে সচেষ্ট হন।

প্রাণনিধিবাবু, মহানাদেরই এক প্রাচীন পরিবারের একমাত্র বংশধর। তাঁর চল্লিশোর্ধ্ব বয়স হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে করেননি। ইতিপূর্বেই আমার জানা ছিল, মহানাদ গ্রামের গঙ্গার ধারে নাকি বিশাল এক শব্দ সমুদ্র থেকে ভেসে আসে, তার ভিতর বায়ু প্রবেশ করলেই মহানাদ ধ্বনিত হতো, সেই থেকেই গ্রামের নাম মহানাদ। কিংবদন্তীর সত্যি-মিথ্যা যাচাই করা কঠিন। আমি হুগলি জেলার নানাস্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। প্রাণনিধিবাবু, আমাকে তাঁর মহানাদ গ্রামের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। আমি বিশেষ রুজুতায় বোধ করেছিলাম।

প্রাণনিধিবাবুর সঙ্গে কলকাতায় সাক্ষাতের মাসখানেক পরে, আমি বিনা সংবাদেই একদিন তার গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ভেবেই রেখেছিলাম প্রাণনিধিবাবুর দেখা পাই ভালো, নয়ত গুপ্তিপাড়া অঞ্চল ঘুরে রাজের মধ্যেই কলকাতা করে আসবো। পরে আবার পড়ে যোগাযোগ করে যাওয়া যাবে।

মহানাদ অতি প্রাচীন গ্রাম এবং এক সময়ে বিশেষ সম্পন্ন ছিল। অতি প্রাচীন হলে যা হয় তাই, ধ্বংসাবশেষের বহু চিহ্ন ছড়ানো। পোড়ো অট্টালিকা, ভাঙা মন্দির, বট অশ্বের আক্রমণে সবকিছু

৪—ভৌতিক গল্প—২

www.banglabookpdf.blogspot.com

ধ্বংসোন্মুখ। বেলা দশটাত্তেই ঝিঝির ডাকে, নিঝুম মনে হলো। বিশাল ভগ্ন ইমারতগুলো দেখলেই অহুমান করা যায়, গৃহবাসীরা এখন প্রবাসী, বারা দেশের নামা জায়গার চাকরী ও ব্যবসা উপলক্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। ভাঙা পোড়ো বাড়ী এখন বাস্তব সাপ, গোখরোর নিশ্চিন্ত বিচরণ ক্ষেত্র। ছ'চারটি ভাঙা পোড়ো বাড়ীতে দেখা গেল দরিদ্র বংশধরেরা এখনো কেউ কেউ টিকে আছে। তাও নিত্যন্ত যেন দায়ে পড়ে। অস্ত্রাঘত দরিদ্র গৃহস্থের কুটিরও কিছু কম নেই। সম্ভবত তারা কৃষি ও মৎস্যজীবী শ্রেণীর। সমস্ত প্রাচীন বাড়ীই যে একেবারে ভেঙে পড়েছে, এমন কথা বলা যায় না। এবং সেসব প্রাচীন অট্টালিকা-সমূহে এখনো মানুষের বাস আছে বোঝা যায়। বড় বড় পুকুর, অধিকাংশ ঘাট ভাঙা, শ্রাওলায় বিবর্ণ। কটলে কটলে সাপের অস্তিত্ব যেন, স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে। জলও সবুজ পানায় ভর্তি।

কিন্তু প্রাণনিধিবিবুর বাড়ী কোনটি এবং কোন্ পাড়ায়? আমি খুঁটিনাটি বুভাস্ত সংগ্রহ করে রাখিনি। গ্রামের পথে, লোকজনের দেখাও তেমন পাচ্ছি না, যাকে জিজ্ঞেস করা যায়। এক-আধজন বাদ্যের দেখছি, তারা বোমটা টানা স্ত্রীলোক, না হয়তো ঘাটে-মাঠে খাটা মাছবা। ভদ্র-গোছেল লোক পেলে স্ত্রীবিধে হয়। চলতে চলতে, ইতিমধ্যেই কয়েক বার চমকে উঠেছি, রাস্তার ছ'পাশের ঝোপে হঠাৎ সড়সড় শব্দ। তারপরে তাকিয়ে দেখেছি। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গোসাপ হিলবিল করে চলে যাচ্ছে।

গা-টা যে একটু শিউরে উঠছে না, তা নয়, কিন্তু গোসাপকে ভয় পাবার কিছু নেই।

একটু লোকের দেখা পেলাম, ছাতা মাথায়, ময়লা ধূতি পাঞ্জাবী পরা, চশমা চোখে—প্রৌঢ়। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'প্রাণনিধি বন্দ্যো-পাধ্যায়ের বাড়ী কোথায় বলতে পারেন?'

চৈত্র মাসে রোদের তেজ নিশ্চয়ই আছে। ছাতা থাকলে আমিও হয়ত মাথায় দিতাম। ভদ্রলোক অসুস্থবিশ্রু চোখে আমার দিকে তাকিয়ে, আপাদমস্তক দেখলেন। দেহবার কিছু ছিল না, আমারও

ধূতি পাঞ্জাবিই সম্বল, বাড়তির মধ্যে চোখে সান-গ্লাস, ঘাড় কাপড়ের ব্যাগ ঝোলালো।

ভদ্রলোক আমাকে দেখে নিয়ে বললেন, 'প্রাণনিধি—মানে পান্নুর কথা জিজ্ঞেস করছেন?'

'প্রাণনিধি—হয়তো ডাক নামে পান্নু হতে পারেন তা আমার জানবার কথা নয়। তা বলতে পারি না, প্রাণনিধি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নাম, এ গ্রামেই বাড়ী। আমি কখনও আসিনি, বাড়ীটা চিনি না, তার সঙ্গে কলকাতায় পরিচয় হয়েছিল।'

ভদ্রলোক এক হাত তুলে, আমাকে কথার মাঝেই নিরন্তর করে বললেন, 'বুকেছি বুকেছি, আপনি পান্নুর কথাই বলছেন। মাথাটা একটু নিয়ে তো—মানে বায়ুগ্রস্ত—তার উপর বেশী লেখাপড়া শিখলে যা হয়। ছেলে অবিশ্রি ভালো।'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'ছেলে না, উনি একজন—'

ভদ্রলোক আবার আমাকে খামিয়ে দিয়ে বললেন, 'ভদ্রলোক, এই তো? তা আপনাদের কাছে'বাই হোক, পান্নু আমাদের কাছে ছেলে-মাছবই। কিন্তু আপনি একটু ভুল রাস্তায় এসেছেন। এ কি আর ছোট-খাটো গ্রাম? চলুন, আপনাকে আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই। আমাকেও ওদিকেই যেতে হবে।

ভদ্রলোকের কথা যথার্থই মনে হলো। গাঁয়ের ছেলেদের বয়স বড়দের কাছে কোনোদিনই বাড়ে না। পথ চলতে চলতে ভদ্রলোক আমার বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। কোথা থেকে আসছি কি কার্খোপলক্ষে, কি করি, ইত্যাদি। যতোটা সম্ভব তার কৌতুহল নিবারণ করলাম। তিনি নিজেই তাঁর নাম বললেন, বলাবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। প্রাণনিধিবিবুর বিষয়ে বললেন, পান্নু ছেলেটি পণ্ডিত, এম. এ পাশ করেছে কিন্তু মাথাটা তেমন ঠিক নেই।' বিরোধ করেনি, বিরাট ভূতুড়ে বাড়ীতে একলা পড়ে আছে। তবে হ্যাঁ, গুণী ছেলে। ওর যা সক্ষম, তা একটা বায়ুগ্রস্তের মতো। কতো পুরনো জিনিষ যে ঘোণাড় করেছে, তার ঠিক নেই। তার মধ্যে বিস্তর সোনারূপো, দামী পাথরও পাবেন। তবে ও সেসব কারোকে দেখাতে চায় না। একটা ঘরের

মধ্যে সব বন্ধ করা আছে।

ভদ্রলোক হঠাৎ গলা নামিয়ে বললেন, 'একদিন হয়ত দেখা যাবে, ডাকাতরা ওকে মেরে রেখে, সব নিয়ে চম্পট দিয়েছে, কিছুই বলা যায় না। যা দিনকাল পড়েছে। বুঝলেন তো?' বুঝেছি, এবং বৃন্দাবন মুখোপাধ্যায় মহাশয় খুব একটা অস্থায়ী বলেননি বোধ হয়। প্রাচীন দামী সংগৃহীত বস্তু যদি এরকম গ্রামের কোনোঘরে থাকে, তবে বিপদ-আপদ ঘটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রাণনিধিবাবু, প্রাণ ধরে কিছুতেই সেসব সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তুলে দিতে রাজী নন, তার বক্তব্য, ওসব জায়গার নাকি আরও বড় শিক্ষিত ডাকাতদের ভিড়।

যাই হোক, বৃন্দাবনবাবুর সঙ্গে আমি সুদীর্ঘ প্রাচীর বেষ্টিত, একটা বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িলাম। মনে হয় দশ-বারো বিঘা জমি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, যার অনেক জায়গায়ই নোনা ধরে, অশথের চারা গজিয়ে ক্ষয় হতে বসেছে। তার ভেতরে, নানান গাছপালা ঘেরা, দরজা-জানালা বন্ধ দোতলা বাড়ী চোখে পড়ছে। আমাদের সামনেই, অথ'বৃত্তাকার খিলানের নীচে, মোটা মোটা গজাল পোতা। সেকালের ভারী পাল্লার বড় দরজা। ভেতর থেকে বন্ধ। বৃন্দাবনবাবু সন্দেশ প্রকাশ করলেন, 'পাল্ল কি বাড়ীতে আছে? কড়া নেড়ে দেখা যাক। পাগলের ডিম, কোথায় হয়তো ঘুরে বেড়ালে।'।

বৃন্দাবনবাবু বড় লোহার কড়া ধরে, জোড়ে শব্দ করলেন। কিন্তু আমার মনে হলো, সে শব্দ বন্ধ স্তব্ধ বাড়ীর ভেতরে পৌঁছানো বোধ হয় সম্ভব নয়। জিজ্ঞেস করলাম, 'প্রাণনিধিবাবু কি একেবারেই একা থাকেন? তার রান্নাবান্না ঘরের কাজকর্ম করে কে?'

বৃন্দাবনবাবু বললেন, 'সেসব কাজের জ্ঞান একটা লোক আছে, মাক বয়েসী বুড়ো, এ গাঁয়ের একটা লোক, কড়ি বৈরাগী নাম। সেই পাল্লর সব কাজ করে, খায়, থাকে।'

তিনি আবার জোরে কড়া নাড়া দিয়ে চিৎকার করে ডাকলেন, 'পাল্ল আছে নাকি হে, অ পাল্ল !.....'

তার চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই ভেতরের ভারী ছড়কো খোলার শব্দ হলো। প্রথম কড়া নাড়া শুনেই বোধ হয়, দরজা খুলতে এসেছিল।

দরজা খোলার পর দেখতে পেলাম, ছোটখাট খুঁটি পরা, গায়ে শুকনো গামছা জড়ানো বয়স্ক লোক। মাথায় বড় বড় বাবরির, কাঁচাপাকা চুল। গৌক দাড়ি কামানো। গলায় কষ্টি, কপালে ও নাকে তিলক কাটা। বৃন্দাবনবাবু বললেন, 'এই যে কড়ি, পাল্ল আছে? উনি কলকাতা থেকে এসেছেন পাল্লর সাথে দেখা করতে।'

কড়ি বৈরাগী ঘাড় কাত করে, অতি কোমল ভাবে বললো, 'আছেন। আপনি আছেন।'

বৃন্দাবনবাবু বিদায় নিলেন। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে, আমি বাড়ীর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। ঢুকে, ডান দিকের প্রায় ভগ্ন ইমারতের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, ঠাকুরদালান। সম্ভবতঃ একদা জুর্গোৎসব ইত্যাদি হতো। ঠাকুরদালানের পাশেই অতি প্রাচীন একটা চারচালা মন্দির, সংলগ্ন আরো ছুটি ছোট ছোট মন্দির, সবই বট অশথের আক্রমণে ধ্বংসোন্মূখ। আশেপাশে কিছু আম-জাম-নারকেল গাছ। কড়ি বৈরাগী দরজা বন্ধ করে আমাকে ডাকলো, 'আছেন বাবু।'

কড়ী বৈরাগীর কথার উচ্চারণ পরিচ্ছন্ন, স্বর কোমল। তাকে ভক্ত মানুষ বলে মনে হয়। সে আমাকে ঠাকুরদালানের উত্তর দিকে, একটি একতলা বাড়ীর দিকে নিয়ে গেলো। মূল দোতলা বাড়ী সেটি বিচ্ছিন্ন। একতলা বাড়ীটির সামনের বারান্দা ছাদ ঢাকা। আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই, একটি খোলা দরজা দিয়ে, প্রাণনিধিবাবু বেরিয়ে এলেন। আমাকে দেখে, খুব একটা বিস্মিত হলেন না। একটু হেসে বললেন, 'ওহ্ আপনি। কোনো চিঠিপত্র দিয়েছিলেন নাকি?'

সংকুচিত হয়ে বললাম, 'না, চিঠি না দিয়েই চলে এলাম। ভাবলাম আপনার সাথে যদি দেখা হয়ে যায় ভালোই, তা না হলে আজ অল্প দিকে ঘুরে চলে যেতাম।'

প্রাণনিধিবাবু গেঞ্জি ছাড়া পাঞ্জাবি পরেছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমি ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। ঘরে বিশেষ কিছু নেই। পুরনো বিরাট ঘর, দেওয়াল আর মেঝের পলস্তারা খসে পড়েছে অনেক জায়গায়। পূর্বদিকের জানালা ঘেঁষে এক পাশে একটা বড় টেবিল, খানকয়েক পুরনো চেয়ার। টেবিলের ওপর লেখবার কাগজ-কলম, কিছু বইপত্র দেখে মনে হলো, প্রাণনিধি-

বাবু বোধহয় লেখাপড়া করছিলেন। আবার সংকুচিত হয়ে বললাম, 'আপনি নিশ্চয়ই কোজে ব্যস্ত ছিলেন, আমি এসে ব্যাঘাত করলাম।'

প্রাণনিধিবাবু বললেন, 'এমন কিছু না, আমার কাজ তো সারা দিন মাস বছরই আছে। কদিন ধরে ভাবছি একটু গোড়া আর পাওয়া যাবে। সময় পেলে, আপনাদের কুকড়াকাটা গ্রামেও একটু ঘুরে আসতে পারি।'

কামরূপ জেলার কুকড়াকাটা গ্রামের নাম আমার জানা, নবকাসুর আর কামাখ্যা দেবীর একটি কিংবদন্তী, সেই গ্রামকে নিয়ে প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রাণনিধি সেখানে যাবেন কেন? জিজ্ঞাসাটা মনে মনেই রাখলাম।

তিনি আবার বললেন, 'তবে এখনই কোনো ব্যস্ততা নেই। বহুন।' কড়ি বৈরাগীর দিকে ফিরে বললেন, 'উনি খাবেন, সেই মতো ব্যবস্থা করো।'

আমি ভক্ততা করে বললাম, 'খাক না, আমি একটু দেখে শুনে।....' প্রাণনিধি বলে উঠলেন, 'এসেছেন যখন, ছ'একদিন থেকে, আশেপাশে ঘুরে যান। অনুবিধে তো কিছু নেই। খাওয়া-দাওয়ার একটু কষ্ট হবে, আমার এখনে নিয়মিত ডাল-ভাত ছাড়া কিছু পাবেন না।'

আমি বললাম, 'যথেষ্ট।' কড়ি বৈরাগী ঘর থেকে চলে গেলো। প্রাণনিধিবাবুর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পরে, তিনি আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। কাঠের পাল্লার নিশ্চিদ্র আলমারী খুলে, অতি সাবধানে রক্ষিত, তার কয়েকটি পুঁথি পুস্তকের সংগ্রহ দেখালেন। বললেন, 'আপনি ইচ্ছে করলে আপনার মনোমতো বিষয়ের বইপত্র পড়তে পারেন।'

আমি আনন্দিত হয়ে বললাম, 'নিশ্চয়ই। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।' 'আ'।' www.banglabookpdf.blogspot.com প্রাণনিধি ভকৃটি বিশ্বয়ে যেন চমকে উঠে আমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'ওহ, হ্যাঁ বুঝছি।'

তার কথাটা ভঙ্গিতে আমারই চমকে ওঠার অবস্থা। তারপরে, তিনি আমাকে নিয়ে একতলা বাড়ী থেকে বেরিয়ে উত্তর দিকে গেলেন। সেদিকে বিশাল বাগান এবং পুকুর। মূল বাড়ীর এটা পেছন দিক

পেছন দিক দিয়েই তিনি—আমাকে নিয়ে, ছোট একটা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, 'একটু অন্ধকার, দেখে আসবেন। প্রায় ছশো বছরের পুরনো বাড়ী। এখনো যে টিকে আছে, সেটাই যথেষ্ট।'

অতি যথার্থ কথা। অন্ধকার কেবল না, বেশ ঠাণ্ডা, ভেজা ভেজা নোনা ইটের গন্ধ ছড়ানো। তিনি বিভিন্ন সন্ন্যাস দালানের ভেতর দিয়ে চলেছেন। আবহাওয়াতে দেখতে পাচ্ছি, অনেক ঘর, এবং সব ঘরেরই দরজা বন্ধ। একটি বড় দালানের প্রান্তে, দোতালার ওঠার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে ডাকলেন, 'কড়ি কড়ি?'

মনে হলো, দেওয়ালের অভ্যন্তর পাশ থেকে কড়ি বৈরাগীর গলা শোনা গেলো, 'যাই বাবা।'

দেখলাম, ডানদিকের একটা দরজা খুলে কড়ি বৈরাগী ঢুকলো। প্রাণনিধি বললেন, 'দোতালার সব ঘর খোলা আছে তো, তালা চাবি বন্ধ নেই?' www.banglabookpdf.blogspot.com

কড়ি বৈরাগী বলল, 'না। শিকল তোলা আছে।' প্রাণনিধি সিঁড়িতে পা দিয়ে আমাকে ডাকলেন, 'আমুন।' আমি তাকে অনুসরণ করলাম। দোতালার ওঠার সিঁড়ি। কিন্তু তার মধ্যেই গোটা কয়েক পাক দিতে হলো। দোতালার উঠে, চৈত্র দিনের আলো দেখতে পেলাম। প্রাণনিধিবাবু বড় চওড়া দালানের দরজা খুলে দিচ্ছেই দক্ষিণের বাতাস ঢুকলো এবং সেই বাতাসে একটি মুহূর্তের গন্ধ পেলাম। কনক চাঁপার গন্ধ।

প্রাণনিধিবাবু বড় দালানের মাঝামাঝি একটা দরজা খুলে স্বল্প পরিসর আর একটি দীর্ঘ দালানে ঢুকলেন। ছ'পাশে ঘর, দরজা বন্ধ। সবই শিকল তালা বন্ধ, কেবল মাঝামাঝি একটি ঘরের কড়ায় ও শিকলের সঙ্গে গোটা কয়েক তালা ঝোলানো দেখতে পেলাম। তিনি সেই স্বল্প পরিসর দালানের শেষ প্রান্তে গিয়ে, আর একটি দরজা খুললেন। সামনেই রানাল্লা। উত্তর দিকের বাগান আর পুকুর দেখা যাচ্ছে। শেষ প্রান্তের পাচ্চিলের ওপারে পোড়ো জমি, ঝোপ-জঙ্গল আর গ্রামের পথও চোখে পড়ে।

আবার আমার ঘ্রাণে একটা মিষ্টি গন্ধ পেলাম। এটিও চেনা গন্ধ,

বাতাবী ফুলের গন্ধ, এখন মুছ। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা এ গন্ধ নিশ্চয়ই অনেক তীব্রতর হবে। প্রাণনিধিবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, ‘অর্থহীন!’

বারান্দা থেকে আবার ঢুকে, পূর্বের একটি দরজার শিকল খুললেন। অন্ধকার ঘর। প্রাণনিধিবাবু ভেতরে ঢুকে, ছুটি জানালা, এবং উত্তর দিকের একটি দরজা খুলে দিতেই ঘরে আলো ঢুকলো। সেই আলোয় দেখলাম, ঘরের একপাশে, প্রাচীন উঁচু খাট, তার ওপরে বিছানা পাতা, এবং তা মোটামুটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রাণনিধিবাবু বললেন, ‘কয়েকটি ঘর নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়। আপনি এ ঘরে শোবেন। উত্তর দিকের বারান্দা দিয়ে পায়খানায় যাওয়া যাবে। আমি থাকি বড় দালানের পূর্ব দিকের ঘরে। এ ঘরে আপনার অস্থবিধে হবে না তো?’

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, ‘না, না, অস্থবিধে আবার কি? কিন্তু আপনি তখন অর্থহীন কথাটা বলেছিলেন কেন?’

প্রাণনিধি বললেন, ‘অর্থহীন না? এতো বড় বাড়ী করবার মানে হয় মশাই! ইট-কাঠের স্তূপ।

আমি হেসে বললাম, ‘আপনার পূর্বপুরুষরা হয়ত বংশধরদের সুখে থাকার জন্যই এসব করেছিলেন। তখন জানতেন না, বাড়ী এরকম খালি পড়ে থাকবে!’

প্রাণনিধি বললেন, ‘বংশধরদের সবাই থাকলে অশ্রুতি খালি পড়ে থাকবার কথা না। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ জাতি বংশধররাই আজ চার পুরুষ ধরে উত্তর প্রদেশের নানান জায়গায় ছড়িয়ে আছে।’

কিন্তু তিনি কেন এখনো এই গ্রামের বাড়ী আগসিয়ে বসে আছেন, তা বললেন না। হতে পারে এখানেই তিনি ভালো আছেন। ঘর থেকে বেরিয়ে প্রাণনিধি উত্তর দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, ‘আপনি যখন বারান্দায় যাবেন, তখন ঘরের ভেতর দিয়েই যাবেন। ইচ্ছে হলে এই দালানের দরজাও খুলতে পারেন।’

আমাকে সব দেখিয়ে শুনিয়ে, প্রাণনিধি আবার নীচে গেলেন। তার সংগ্রহশালা আমাকে দেখালেন না। কিছু বললাম না। কলকাতা

থেকে স্নান করেই বেরিয়ে ছিলাম। প্রাণনিধিবাবু আমাকে বাঁহাে একতারা বাড়ীতে রেখে স্নান করে কাপড় জামা বদলে এলেন। তার পরে খেতে গেলাম। একান্তই নিরামিষ। প্রথমে পাত্রে যি দিয়ে নিম পাতা ভাজা, তারপর মুগ ডাল, খোঁচার ঘট, কচি আমের অম্বল। কড়ি বৈরাগীর হাতের রান্নাটি ভালো। অতঃপর বিজ্ঞান। দোতালার যাবার আগে, আলমারী থেকে আমি একটি তুলোটি কাগজে হাতে লেখা প্রাচীন পুঁথি পড়বার জন্য নিলাম, নাম, ‘আত্মা পরলোক সম্বন্ধ’। চৈত্রেয় নিদাঘের একটি বিশেষ মাদকতা আছে। পূর্বের জানালা দিয়ে হাওয়া আসছিল। ঘরের খাটের বিছানায় তুলোটি কাগজে হাতে লেখা পুঁথি পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, খেয়াল নেই। হঠাৎ একটি শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। মনে হলো, ঘরের মধ্যে কেউ, পায়-জোড় পায়ে, ঝুমু ঝুমু শব্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চোখ তাকিয়ে দেখলাম, ঘরে দিনের আলো, কিন্তু শব্দটা যেন তখনো। মেঝের ওপর দিয়ে, ঝুমু ঝুমু শব্দটা হেঁটে, খোলা দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি বালিশ থেকে মাথা তুলে তাকালাম। কিছুই দেখতে পেলাম না, শব্দও শুদ্ধ হয়ে গেলো।

উঠে বসে ভাবলাম, হয়তো কোনো স্বপ্ন দেখছিলাম। কিন্তু কিছু মনে করতে পারলাম না। দেখলাম, বালিশের কাছে পুঁথিটি ভেঙে মিন রয়েছে। তারপর মনে হলো আদৌ কিছু শুনেছি কি? নিশ্চয়ই না। বাঁ হাতের মনিবন্ধে ঘড়িটা পরাই ছিল। সময় দেখলাম, তিনটে বেজেছে। এখনো একটু তন্দ্রার ভাব আছে। আবার বালিশের ওপর মাথাটা দিলাম। একটু পরই মনে হলো, সেই ঝুমু ঝুমু শব্দটা কানে আসছে, কিন্তু অনেক দূর থেকে। যেন সামনের চওড়া দালানে পায়জোড় বা বাজুবন্ধ পায়ে, কেউ ঝুমু ঝুমু শব্দে হেঁটে বেড়াচ্ছে। শব্দ বেশ হালকা, যেন শিশুর পায়ের মতো। কিন্তু এ বাড়ীতে শিশু বা নারীর কোনো অস্তিত্ব আছে বলে শুনিমি। তবে এ শব্দ কিসের, কার? আমি এখন পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত, শুনতে তুল হবার কোনো কারণ নেই।

মুহূর্তেই আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সচকিত করে দিয়ে, দক্ষিণের বড় ঘর থেকে দালানে ঝুমু ঝুমু শব্দ, স্বল্প পরিসর দালান দিয়ে, এ ঘরের দিকে

এগিয়ে আসতে লাগলো। আমি আড়ষ্ট হয়ে শুয়ে রইলাম। কে আসছে বা কে আসতে পারে, এই রকম ঝুম ঝুম শব্দে ?

আমি স্পষ্ট টের পেলাম, ঝুম ঝুম শব্দ যেন আমার ঘরের দরজার সামনে এসে চূপচাপ দাঁড়াল। আমি আস্তে আস্তে মাথা তুলে, দরজার দিকে তাকালাম। আশ্চর্য! কেউ নেই! খোলা দরজা, দক্ষিণ দিক থেকে দালানে দীর্ঘ সরু আলো এসে পড়েছে।

শুয়ে থাকতে পারলাম না, উঠে বসলাম। একটু অপেক্ষা করে, খাট থেকে নেমে, দরজার কাছে গিয়ে দক্ষিণ দিকে উঁকি দিলাম। কেউ নেই। মুখোমুখি বন্ধ ঘরগুলোর মাঝখানের সরু দালানে দক্ষিণের বাতাস ঢুকে, নিঃস্রবণের পথ খুঁজে না পেয়ে, যেন এক রকমের হাওয়াশাস তুলছে।

আমি সরু দালান পেরিয়ে দক্ষিণের বড় দালানে গেলাম। আমার বাঁ দিকেই, একটি ঘরের দরজা খোলা; এবং অংশতঃ দৃষ্ট বাটে প্রাণনিধি-বাবুর শায়িত শরীরের অংশবিশেষ চোখে পড়ল। কাছে গিয়ে, দরজার সামনে থেকে দেখলাম, তিনি গভীর দিবানিদ্রায় মগ্ন।

দরজার কাছ থেকে কিরতে উদ্ভত হতেই, সরু দালানে ঝুম ঝুম হালকা ধ্বনি শুনতে পেলাম। অথচ আমি বড় দালানের, দক্ষিণ খোলা জানালার আলোতে দাঁড়িয়ে আছি। মনে হচ্ছে, সরু দালানের ভেতর দিয়ে, সেই শব্দ যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে। আমি ধমকে দাঁড়ালাম। দৃষ্টি সরু দালানের দরজার দিকে। ঝুম ঝুম শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল। আমার বুকের ওঠানামা ক্ষত হয়ে উঠলো, কিছু একটা দেখবার প্রত্যাশায় আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়, আমার দৃষ্টিতে কেন্দ্রীভূত হলো।

কিন্তু সরু দালানের দরজার কাছে এসেই আড়ালে সে শব্দ ধমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি ক্ষত পায়ে দরজার কাছে গেলাম। কেউ নেই, দালান শূন্য। অভাবিত ব্যাপার, আমি ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে দেখলাম। কোথাও কোনো জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই! যেন জেগে স্বপ্ন দেখার মতো। মুখ কিরিয়ে প্রাণনিধিবাবুর ঘরের দিকে দেখলাম। একই দৃশ্য।

সেই মুহূর্তেই, সিঁড়ির মুখে ঝুম ঝুম শব্দ জেগে উঠলো। এবং শব্দ যেন সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো। আমি এগিয়ে গেলাম। শব্দ অহুসরণ

করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম। ঝুম ঝুম শব্দ, সিঁড়ির নীচে অবধি গিয়েই স্তব্ধ হলো, আর আমি শুনলাম, টং টং করে, একতারা বাজছে, সিঁড়ির পাশের দেয়ালের আড়ালে। সেদিকে একটা দরজা আছে, সেটা ভেজানো। আমি এবার ঝংকারের সঙ্গে গভীর কিন্তু কোমল স্বরের গান শুনতে পেলাম:

‘ঝুমর ঝুমর নুপুর বাজে
বধূরাণী যায় অভিসারে
কী বা অপরূপ সাজে।’.....

আমি এগিয়ে গিয়ে দরজাটা আস্তে ঠেলে খুললাম। দেখলাম, কড়ি বৈরাগী চোখ বুজে, একতারা বাজিয়ে গান করছে। ঘরটিতে পেতল কাঁসার রান্নার সাজসরঞ্জাম সাজানো। কড়ি আমার উপস্থিতি টের পেলো না। আমিও তাকে না ডেকে, দরজা আস্তে টেনে দিয়ে কিরে দাঁড়ালাম।

নীচের সবকিছুই বন্ধ এবং প্রায় অন্ধকার। দরজা জানালা ফুটো-কাটা দিয়ে বা সামান্য আলো আসছে। নীচের বড় দালানের মাঝখানে দোতালার মতোই একটি ছোট দরজা রয়েছে, এদিক থেকে শিকল টেনে বন্ধ করা। বাড়ির পেছন দিয়ে, ওই দরজা দিয়েই প্রাণনিধিবাবুর সঙ্গে এদিকে এসেছিলাম।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। আর কোনো শব্দ শুনতে পেলাম না। আবার উপরে উঠলাম। দীর্ঘ সরু দালানের দরজা দিয়ে ঢুকে, নিজের ঘরে গেলাম, এবং ঘরের উত্তর দিকের দরজা খুলে দিয়ে আবার পুঁথিটি নিয়ে বসলাম।

খানিকক্ষণ বাদেই, প্রাণনিধিবাবু এলেন। সস্তা ঘুম ভাঙ্গা, কোলা-কোলা মুখ, জিজ্ঞেস করলেন, ‘একটু কি দিবানিদ্রা দিলেন, নাকি সেই থেকে পড়ছেন?’

বললাম, ‘না, একটু ঘুমিয়েছিলাম।’

প্রাণনিধি, বললেন, ‘আমি আবার একটু না ঘুমিয়ে পারি না। একটু চা চলবে তো?’

বললাম, ‘চলবে।’

তিনি বললেন, 'তাহলে চলুন, যুগ ধরে জামা-কাপড় পরে একটু নীচে বাই। তা খেয়ে, একেবারে বেরিয়ে পড়বো, ঘুরেট্টে কিরবো।'
বললাম, 'তাই চলুন।'

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিরে আসতেই আমি আর প্রাণনিধিবাবু বাড়ী ফিরে এলাম। গ্রামের কোন পাড়ায় তিনি স্বর্ণমুদ্রাটি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, তা দেখিয়েছেন। প্রাচীন গ্রাম এবং গঙ্গার ধারেই আমাদের বেড়ানো সীমাবদ্ধ রইলো।

বাড়ীর মধ্যে, হারিকেনের আলো। একতলা বাইরের বাড়ীতে বসে প্রাণনিধিবাবু তাঁর নানাবিধ বস্তুর সংগ্রহের কাহিনী শোনালেন। অবিশিষ্ট তাঁর কাহিনী শোনাও মুশকিল। কথা বলতে বলতে প্রায়ই অতমনস্ক হয়ে পড়েন।

রাত্রি প্রায় সাড়ে নটার সময়ে, কড়ি বৈরাগী আমাদের খেতে ডাকলেন। দেখা গেলো, রাত্রে লুটির ব্যবস্থা, তার সঙ্গে কুমড়োর ছেঁচকি, ডাল আর কচি পটলের সঙ্গে আলুর ডালনা এবং হুধ। পরের দিন সকালে গুপ্তিপাড়া, বেহুলা ইত্যাদি গ্রাম ঘুরতে যাবার প্রোগ্রাম করে শুভে গেলাম। কড়ি বৈরাগী জানালো, উত্তরের বারান্দায়, বাথরুমে বালতিতে জল দেওয়া আছে।

ঘরে ঢুকে দেখলাম, খাটে মশারি টাঙানো, চারদিক গোঁজা। হারিকেন জ্বলছে। এক পাশে একটি জ্বলের কুজো, মুখে ঢাকা কাঁসার গেলাস। রাত্রি ভেমন বেশী না হলেও, শুয়ে পড়লাম। তার আগে হারিকেনটা একটু কমিয়ে রাখলাম, একেবারে অন্ধকার করলাম না।

ওয়েও বেশ খানিকক্ষণ এম এলো না। বাইরের গাছপালায় চৈত্র বাতাসের হু হু শব্দ, কনকচাঁপা আর লেবু ফুলের গন্ধ ছড়াচ্ছে। ঘুমটা ঠিক এসেছিল কিনা, বুকে ওঠার আগেই, আবার সেই ঝুম ঝুম শব্দ ঘরের মেঝের শোনা গেলো। ঘরের মেঝের গুণ্ডু না, মনে হলো, হেঁটে সেই শব্দ খাটের সামনে এসে থামলো।

আমি বালিশ থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে, স্তব্ধ হয়ে গেলাম। দেখলাম, ছোটখাট একটা ছায়ামূর্তি মশারির বাইরে আমার দিকেই যেন তাকিয়ে

আছে। আমি উঠে বসতে বসতেই, কমানো হারিকেনের আলোয়, সেও মূর্তি যেন অনেকটা স্পষ্ট রূপ ধারণ করলো। দেখলাম, একটি সাত-আট বছরের কস'। মেয়ে, লাল পাড় শাড়ি পরা। কপালে এবং সিঁথিতে সিঁহুর। গায়ে কোনো জামা নেই, কিন্তু হাতে, ডানায়, গলায়, কানে সোনার অলংকার। ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি, ভাগুর কালো চোখের স্থির দৃষ্টি আমার দিকে।

কয়েক মুহূর্ত সেই চোখের দিকে তাকিয়ে, আমি কেমন যেন আচ্ছন্নবোধ করলাম। দেখলাম সাত-আট বছরের বিবাহিতা বালিকা, আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। দেখে, আমি মন্ত্রচালিতের মতো, মশারির বাইরে খাট থেকে নেমে দাঁড়াতেই, বালিকা বৃষ্টি দরজার কাছ থেকে, হাতছানি দিয়ে ডেকে আমাকে খিল খোলবার ইঙ্গিত করলো। আমি এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললাম। বালিকা আমাকে হাতছানি দিয়ে দক্ষিণের বড় দালানের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখালো। বালিকা আমার আগে ঝুম ঝুম শব্দে এগিয়ে চলেছে, আমি তাকে অহসরণ করে চলেছি।

বড় দালানে পৌঁছে, সে সিঁড়ির মুখে গিয়ে, হাতছানি দিয়ে আমাকে নীচের দিকে যাবার ইঙ্গিত করলো। অন্ধকারে বালিকার মূর্তি কেমন করে এতো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সে প্রশ্ন আমার মনে একবারও জাগল না। নীচে নেমে, বড় দালানের মাঝামাঝি, সরু দালানের দরজার কাছে ঝুম ঝুম শব্দে গিয়ে বালিকা দাঁড়াল, এবং আমাকে আবার হাতছানি দিয়ে সরু দালানের দিকে অহসরণ করতে ইশারা করলো। নিজের সম্পর্কে কোনো চেতনাই আমার নেই। বালিকাকে অহসরণ করলাম। একটা ঠাণ্ডা বাতাসের ভেজা স্পর্শ অহুভব করলাম। সরু দালানের ভেতরে খানিকটা গিয়ে বালিকা আমাকে একটি বাঁ দিকের ঘরের মধ্যে ডাকলো।

সেই ঘরে ঢুকে দেখলাম, হারিকেন জ্বলছে এবং ক'ট নারীমূর্তি—সকলেই নানা কাজে ব্যস্ত। আমি ঢুকতেই, সকলে আমার দিকে তাকালো। দেখলাম, দশ থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যে বয়স, সকলেই বিবাহিতা। কপালে কেশ'টি, সিঁথিতে সিঁহুর। কারোর গুণ্ডু লাল পাড়, কারোর লালের ওপর ফলকা দেওয়া, জলধাকা শাড়ি পরা। কারোরই জামা নেই। হাতে, গলায়, কানে ও পায়ে সকলেরই নানান অলংকার

সাত-আট বছরের বালিকার মতো। কিশোরী আর যুবতীরা সকলেই করসা আর হুন্দরী। বালিকাটিকে নিয়ে, সর্বসাকুল্যে সাতজন।

সকলেই আমার দিকে তাকিয়ে, নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে, যেন অর্থপূর্ণ হাসি হাসলো। তারপরই দেখলাম, তারা যে যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কেউ শিলনোড়ায় কিছু বাটছে, কেউ হামানদিতায় কিছু গুঁড়ো করছে, কেউ জলের পাত্রে, পাখরের গেলাস নিয়ে জল ঢালা-তোলা করছে।

তাদের মধ্যে ষোলো-সতের বছরের একটি তরুণী হঠাৎ যেন হুঁপিয়ে কঁদে উঠলো, এবং তার বৃকের অঁচল খসে পড়লো। কান্নার কোনো শব্দ শ্রুত হলো না। সে তার স্বাস্থ্যোদ্ভূত তরুণী বৃকে হাত দিয়ে নজরে চাপড়াতে লাগলো। কেন সে কঁদছে? একই বয়োজ্যেষ্ঠ আর একজন তাকে বৃকের কাছে টেনে নিয়ে, নানারকমে যেন সাশ্বনা দিতে লাগলো। সেই সাত-আট বছরের বালিকাও ওদের মাঝখানে পড়ে কঁদতে লাগল। অথচ কান্নার কোনো শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে না। কেবল রুদ্ধ কান্নার দমকা নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ এই রকম কান্নাকাটির পরে সকলেই আবার ধামলো। আবার তারা যে যার কাজে ব্যাপৃত হলো। তারা একান্ত নিজেদের মধ্যে, শিখিল এবং স্থপিত ও উদাম, উন্মুক্ত অঙ্গের জন্ত কেউ লজ্জিত না। তারা নিজেদের মধ্যে, নিঃশব্দে কথা বলাবলি করছে, হাসাহাসি করছে। তাদের সুবর্ণমণ্ডিত যৌবনোচ্ছল শরীরগুলো যেন বিবসনা হুন্দরীদের মতো, আমার সামনে জীবন্ত প্রতিমাব্যব আচরণ করছে। তাদের কথাবার্তা, আচার-মাচরণ আমার খুব স্বাভাবিক লাগছে না। আমি বুঝতে পারছি, আচ্ছন্নতার মধ্যে একটা মুহূর্ত আমার প্রাণের মধ্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে। নানা বয়সের এই বিবাহিতা নারীরা কি করছে, কিছুই বুঝতে পারছি না। তারা আমার খুবই নিকটে, তথাপি যেন ধরাছোঁয়ার বাইরে। একটা গীত গন্ধ আমার দ্রাবকে অতিমাত্রায় রুদ্ধ করে তুলতে লাগলো।

তারপরে, আবার তারা পরস্পরকে জড়িয়ে কান্নাকাটি শুরু করলো। তাদের দীর্ঘ কালো কেশ আলুলায়িত, শাড়ির কোনো স্থিরতা রইলো না। যতোকণের প্রস্তুত তরল পদার্থ তারা পাখরের পাত্রে ভরে পান করলো।

সকলেই পান করলো, এবং ক্রমে তাদের মুখে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ফুটে উঠতে লাগলো। তারা সকলেই যেন যন্ত্রণায় ছটফট করে, হুঁকড়ে, বৃক চাপড়াতে লাগল। সকলের আগে, সাত-আট বছরের বালিকাটি প্রায় নয়াবস্থায় সম্পূর্ণ স্থির হয়ে গেলো এবং তার সোনার মতো শরীর নীলবর্ণ ধারণ করলো। একে একে সকলের দশাই একরকম হলো। আমার চোখের সামনে, সাতটি বিভিন্ন বয়সের বালিকা, কিশোরী, যুবতী, চোখ বুজে মৃতবৎ পড়ে রইলো এবং সকলের বর্ণই নীল হয়ে উঠলো।

সহসা একতারার স্বকার শুনে আমি চমকে উঠলাম, এবং মুহূর্তেই আমার চোখের সামনের দৃশ্য অপসারিত হলো। দেখলাম, আমি একটি স্বকার ঘরে ভূতগ্রাস্তের মতো, যেন সত্তা স্বপ্ন ভেঙ্গে ভেঙ্গে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। কেবল একটা চামচিকা, ক্রু ক্রু করে আমার চারপাশ প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছে। আমার গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠলো, তৎক্ষণাৎ ঘরের বাইরে এলাম। সরু দালানে পা দিতেই, দক্ষিণের বড় দালানে নম্র পড়লো। ভাঙ্গা দরজার ফাঁক দিয়ে, সেখানে ভোরের আলোর ইশারা চোখে পড়ছে। একতারার শব্দও ওদিক থেকেই আসছে। আমি ক্ষুণ্ণত পায়ের বড় দালানে গেলাম, এবং দেখলাম, কড়ি বৈরাগী, দালানের বড় দরজার সামনে বসে, একতারা বাজিয়ে গান করছে। তার চোখ বোজা, সে আমাকে দেখতে পেলো না। তার গানের কথাগুলো শুনলাম:

‘আমার রাইবিনোদিনী,

সখী সন্দে যাবে মথুরা

এ বৃন্দাবন গোবুল, রাইগোপিনী হারা।’.....

আমি প্রায় মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে তার গান শুনলাম। আবার বড় দালানের ভেতর দিয়ে বাঁ দিকে তাকালাম। আলো নেই, কোনো জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। সাতটি স্বর্ণ প্রতিমাব্যব নারী তো দূরের কথা। অথচ সারারাত আমার একভাবে দাঁড়িয়ে কেটে গেছে।

আমি আমার শোবার ঘরের চেহারা দেখবার জন্ত কৌতূহলিত হয়ে ক্ষুণ্ণত পায়ের সিঁড়ি দিয়ে উপরে গিয়ে বড় দালান পেরিয়ে গেলাম।

ঘরে ঢুক দেখলাম, রাত্রে সেই ঘর। হারিকেন তেমনি কমানো। আমি যেখান দিয়ে মশারি ফাঁক করে বেরিয়েছিলাম, সেখানে মশারি এখনো তেমনি আলগা করা। আমার চোখের সামনে সেই বালিকার মূর্তি ভেসে উঠলো। তারপরে বাকী ক'জনের মূর্তিও। আমি অভাবিত বিশ্বয় নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু বেশীক্ষণ পারলাম না। মনে হলো চোখ ছুটো জ্বালা করছে, বুজ আসছে। আমি মশারির মধ্যে গিয়ে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙলো বেশ বেলায়। প্রায় ধড়মড় করে উঠে বসলাম। রাত্রে সমস্ত কথাই মনে পড়ল, যদিচ কোনো কুল-কিনারাই পাচ্ছি না, এবং এখন সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন অবাস্তব আর অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। আমি উত্তরের দরজা খুলে, বাথরুমে গিয়ে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে ঘরে গিয়ে দেখলাম, মশারি তোলা হয়ে গেছে। প্রাণনিধিবাবু বসে আছেন খাটের ওপর। জিজ্ঞেস করলেন, 'রাত্রে ভালো ঘুম হয়েছিল?'

আমি নির্দিধার বললাম, 'প্রথম রাতে তেমন হয়নি। নতুন জায়গা তো। তাই বেশ বেলায় ঘুম ভাঙল।'

প্রাণনিধি এ বিষয়ে আর কোনো কথা না বলে, অল্প কথা বললেন- 'তা হলে চলুন, একটু কিছু খেয়ে ঘুরে আসা যাক।'

আমি বললাম, 'চলুন।'

আমরা ছপুর পর্যন্ত ঘুরে এসে স্নান-খাওয়া-দাওয়া করলাম। শতাবতই রাতে ঘুম হয়নি বলে, দিনের বেলা ঘুম পেলো, এবং আবার সেই ঝুম ঝুম শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেলো। শব্দ ছাড়া দিনের বেলা কিছু দেখতে পেলাম না। কেবল নীচের দালানে গিয়ে সেই শব্দ হারিয়ে গেলো, এবং কড়ি বৈরাগীর একতারার গান শোনা গেলো।

এ বিষয়ে প্রাণনিধিবাবুকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও পারলাম না। আরো একটা অবাক লাগলো, তিনি তাঁর সংগ্রহশালা একবারও আমাকে দেখাবার কথা বললেন না।

রাতে ঘুমাতে যাবার পরে আবার সেই বালিকার আবির্ভাব ঘটলো, এবং গভরাজের মতোই হাতছানি দিয়ে ভেঁকে নিয়ে গেলো। আজ যেন

আমার নিশিঘোরের কোঁতুলই বেশী। আজো আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সাত সোনার প্রতিমার সেই একই আচার-আচরণ, এবং নিদ্রাভিত্ততা অবস্থায় নীল হয়ে যেতে দেখলাম কিন্তু তার আগেই আমি ব্যাকুলভাবে বলে উঠলাম, তোমরা কে? তোমরা কারা! তোমরা কি করছো?.....

জবাবে আমি কড়ি বৈরাগীর একতারার ঝংকার শুনলাম, এবং অন্ধকার দেখলাম।

বাইরে সেই ভোরের আলো।

ঘুম ভাঙলো তেমনি বেলাতেই। আজ আমার কলকাতা ফেরার দিন। অথচ সাতটি স্রব প্রতিমার আকর্ষণ যেন কিছুতেই কাটাতে পারছি না। মনে হচ্ছে, সারা জীবন ছপুর ও রাত্রিগুলোর অন্ধকারে, আমি সাত প্রতিমার সান্নিধ্য খুঁজে কিরি।

কিন্তু সে কথা প্রাণনিধিবাবুকে বলতে পারলাম না। তবে আজ বলেই কেললাম, আপনার সংগ্রহশালাটি দেখবার খুব ইচ্ছে ছিল।

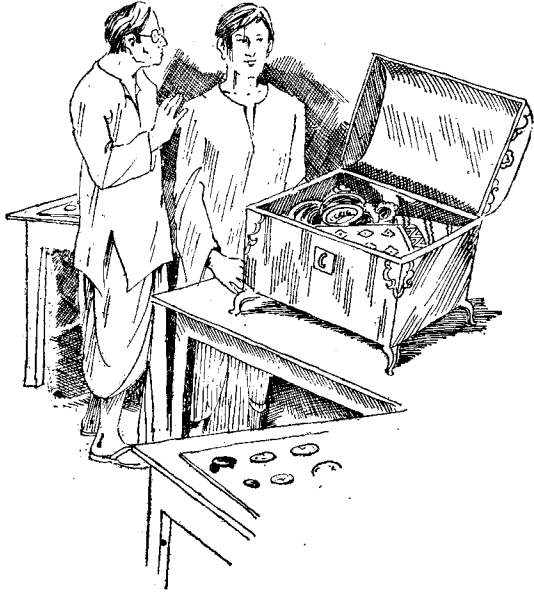
প্রাণনিধি বললেন, চলুন, দেখবেন।

তিনি একগোছা ঢাবি নিয়ে, দোতালার সরু দালানের মধ্যে, সেই ভালো বন্ধ ঘরের তাল খুললেন। দরজা খুলে, জানালা উন্মুক্ত করতেই, দীর্ঘ টেবিলের উপর নানা রকম স্রব ও রৌপ্য দেখতে পেলাম। নানা-রকম দামী ও মহার্ঘ্য পাথরও রয়েছে। সবকিছুরই পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পাশে পাশে কাগজের বোর্ডে লেখা আছে। আমি চমৎকৃত হয়ে গেলাম। শুধু নেশা নয়, অতি নিষ্ঠা না থাকলে এরকম সংগ্রহ কেউ করতে পারে না।

এক পাশে, একটা বড় কাঠের বাজের চাকনা খুলে চমকে উঠলাম। দেখলাম, কৃত্তলো লাল এবং লালের উপর কক্স দেওয়া শাড়ী, তার উপরে স্ত্রীপীকৃত সোনার গহনা। আমার খুবই চেনা গহনা এবং শাড়ী, যা আমি সেই সাত প্রতিমার গায়ে দেখেছিলাম।

আমি প্রাণনিধির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এগুলো কিসের সংগ্রহ প্রাণনিধিবাবু?

তিনি বললেন, ওগুলো আমাদের পারিবারিক সংগ্রহ, এক ট্রাজেডির সাক্ষী।



আমি ব্যাকুল বিষয় ও কৌতূহলে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিসের ট্রাজেডি?

প্রাণনিধিবাবু একই ছপ থেকে বললেন, ট্রাজেডিটা ঘটেছিল, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। আমার প্রপিতামহের সাত বোনকে, এক রাত্রে, এক বৃদ্ধ কলীনের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সাত বছর বয়স থেকে, হুড়ি-পড়িশের মধ্যে তাদের সকলের বয়স ছিল।

প্রাণনিধিবাবু খামলেন।

আমি রুদ্ধশ্বাস হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তারপর?

তিনি বললেন, কলীনের ব্যাপার তো সবই জানেন। কিন্তু ঘটনাটি যদি ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় ঘটতো, কি হতো জানি না, কিন্তু শেষের দিকের হাওয়া একটু অস্বরকম ছিল। প্রপিতামহের বোনরা, সে বিয়ে মেনে নিতে পারেননি। সকলেই এক রাত্রে, বিব খেয়ে এক সঙ্গে আত্মহত্যা করেছিলেন। এসব চিহ্ন তাদেরই।

আমি অপলক চোখে সেই বাকসের শাড়ী আর গহনাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার কানে বাজতে লাগলো ঝুম ঝুম শব্দ ও চোখের সামনে ভাসলো, সাতটি সুবর্ণ জীবন্ত প্রতিমা।

একটি দীর্ঘশ্বাস কেলে, আমি কাঠের বাকসের ঢাকনা বন্ধ করলাম, শতাব্দীর ওপারের সাতটি প্রাণের যন্ত্রণা, আমাকে আহ্বান করছিল। জাতির এক অভিশপ্ত খেলার সেই করুণ চিহ্ন আমি দেখেছি।

হৃৎপুরের খাওয়ার পরেই আমি কলকাতা রওয়ানা হয়ে গেলাম।

খেছেন : সমরেশ বসু }

বাঁশী

অদ্ভুত মিষ্টি স্বর। স্বরটা কেঁদে কেঁদে কেঁদে। করুণভাবে হৃদয়টাকে মোচড়াতে থাকে। বিরহ বাথাতুর একখানা মুখ ভেসে উঠে। মনের কোণে কে যেন কেঁদে কেঁদে বলে, ওগো থাকে চাও তাকে তো পাবে না। সে চলে গেছে—এ তারভরা আকাশের চেয়েও দূরে এক অচিন্তনীয় রাজ্যে। চোখের কোণে জল জমে উঠে।

প্রতি রাত্রে! হ্যাঁ, প্রতি রাত্রেই শোনা যায় মিষ্টি মধুর এ বাঁশীর আওয়াজ। অন্ধকার রাত্রে যখন কীণ শব্দে বয়ে যায় গঙ্গা, যখন কালো ওড়নার আড়ালে আকাশ ও নদী মিলে যায়, শোনা যায় একটা মধুর বাঁশীর আওয়াজ গঙ্গার মাঝ থেকে।

ছোটো ছোটো ছোটো ছায়া ঘেরা গ্রাম ছপাশে। তারই মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে গঙ্গা। খুব প্রশান্ত কিন্তু মাঝখানে দেখা যায় সুদীর্ঘ বালুর চর। দিনে রোদের আলোয় ঝিকমিকিয়ে ওঠে চরের বালু। রাতের বেলায় নেমে আসে একটা অদ্ভুত স্তম্ভতা। প্রেতপুরীর মতই মনে হয়। গভীর রাত্রে অকস্মাৎ শোনা যায় একটা মধুর স্বর—এ চরের দিক থেকে!

বালুর চরটা ত্রিকোণ। সমরে অসময়ে কতগুলো নাম-না-জানা পাখী উড়ে গিয়ে বসে এ চরে। মাঝে মাঝে গ্রামের কোন শৌখীন পরিবার এ চরে যায় চড়াই-ভাতি করতে।

চরে থাকে একটা পাগলা। দিনের বেলা গ্রামের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়, আর রাত্রে আশ্রয় নেয় চরে এ জগা পাগলা—প্রেতপুরীর উপযুক্ত রাজা।

বাঁশীর কথা জিজ্ঞাসা করলে পাগলা শুধু হাসতে থাকে। পাগলাকে নাম জগা।

বাঁশী

একদিন জগা একটা গাছতলায় বসে আপন মনে মাটিতে আঁচড় কাটছে, আর হাসছে। হঠাৎ সেখানে স্থজিত এসে হাজির হয়। কি করছিসরে জগা, তুই এখানে? স্থজিত জিজ্ঞাসা করে।

স্থজিত এই গ্রামেরই ছেলে। স্কুল কাইনাল পরীক্ষা দিয়ে সবে ফিরছে।

স্থজিতের কথা শুনে জগা শুধু হাসতে লাগলো।

হ্যাঁরে জগা, বলতে পারিস রাতের বেলায় বাঁশী বাজায় কে?

হঠাৎ হাসি থামায় পাগলাটা। বিজ্ঞী মুখটা কুঁচকে আরো বিভৎস করে তোলে। আপন মনে বিড় বিড় করতে থাকে।

পারলাম না, পারলাম না, কিছুতেই পারলাম না!—পাগলাটার চোখের কোণে জল দেখা দেয়।

কি বকছিস রে?—স্থজিত জিজ্ঞাসা করে।

এ্যা। হঠাৎ পাগলাটা যেন সন্নিহিত কিরে পায় এবং হাসতে শুরু করে।

নিরাশ হয়ে স্থজিত কিরে যায়। সন্ধ্যা নেমে আসছে দেখে পাগলাটা জলে ঝাঁপিয়ে সাঁতারে যেতে থাকে, অদূরবর্তী চরের দিকে। লোকটা ওস্তাদ সাঁতাক।

রাত্রে স্থজিত প্রায়ই আসে। চোখ বৃজে শুনতে থাকে বাঁশীটার আওয়াজ। মনে হয় কে যেন কাঁদছে, আর আকুল ভাবে কেঁদে কেঁদে ডাকছে তার পথের সাথীকে। কে নিয়ে যাবে তাকে নতুন রাজ্যে। স্বপ্নময় নিদ্রারাজ্য থেকে কঠোর বাস্তবে।

দূরে তালগাছের মাথায় একটা প্যাঁচা চেঁচিয়ে ওঠে। শুনে শুনে স্থজিতের তরুণ রক্ত উদ্ভাদ হয়ে ওঠে। দেখতে হবে, জানতে হবে—কে বাজায় এ বাঁশী।

হঠাৎ খেনে যায় বাঁশী।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে স্থজিত।

পরের দিন সকালে স্থজিত মনস্থির করে কেলে। আজকে, হ্যাঁ আজকে ও যাবেই এ বাঁশী বাদকের সন্ধান। গ্রামবাসীকে দেখিয়ে দেবে সে বিংশ শতাব্দীতে ভূতের অস্তিত্ব সম্পর্ক অমূলক।

হঠাৎ পথের মাঝে দেখা হয়ে যায় বন্ধু সময়ের সাথে। সময়ের মনেও ভেগেছে এই একই প্রশ্ন। কে বাজায় এই বঁশী?

চুপি চুপি সারাদিন পরামর্শ করে তারা ঠিক করলো, আজই রাতে তারা যাবে এই চরে।

মন্দিরের ঘন্টায় জোরে জোরে বারোটা বাজার ধ্বনি। নিরুৎসাহ রাত্রি। শুধু নদীর জলের একটানা একটা শব্দ শোনা যায়।

একপাশে জেলোদের নৌকাগুলো বাঁধা। স্থজিত আর সময় গিয়ে ওঠে ছোট একখানা নৌকায়। বৈঠা টেনে এগিয়ে চলে ওরা। দাঁড় ধরলো স্থজিত। এ কাজটা ও শিখেছে ভালোভাবেই। নৌকাখানা ছলতে ছলতে এগোতে থাকে চরের দিকে।

মুহম্মদ হাওয়া বইছে। ভেসে আসে গ্রাম থেকে সদ্য পাকা আমের মিঠে মিঠে গন্ধ। আকাশে চাঁদ নেই। তারাগুলি মিট মিট করে ঝলে আর দেখে এই ছোটো ছুঁসাহসী তরুণের নৈশ অভিযান।

নৌকো এগিয়ে চলে।

টচটা আছে তো?—স্থজিত কিস্ কিস্ করে সময়কে বলে।

আছে।—পকেটে হাত দিয়ে সময় সংকীর্ণ জবাব দেয়।

দূরে অস্পষ্ট ভাবে চরটাকে দেখা যায়। সতর্ক হয়ে ওঠে ওরা। জোরে জোরে দাঁড় টানতে থাকে।

ঘাস্—স্। বালুর চরে নৌকা আটকেছে। নেমে পড়ে ওরা। পকেট থেকে টচটা বের করে বালুর ওপর আলো ফেলে সময় অগ্রসর হয়। স্থজিত সময়কে অনুসরণ করতে থাকে।

সহসা দূরে একটা মূর্তির ওপর নব্বুর পড়ে ওদের। সুদীর্ঘ পদক্ষেপে মূর্তিটা ওদের দিকেই এগিয়ে আসে।

নিজের অজান্তে দেহের লোমকূপ খাড়া হয়ে ওঠে। কাছে আসতেই ওরা ওকে চিনে ফেলে—মূর্তিটা আর কেউ নয় স্বয়ং জগা পাগলা।

পাগলটা ওদের দেখে হেসে ওঠে, কি বাবু! এ সময় এখানে কি মনে করে?

স্থজিত কি যেন বলতে বাঙ্ছিলো। হঠাৎ তীক্ষ্ণ তীর একটা বঁশীর সুরে চমকে ওঠে ওরা।

পাগলটা হঠাৎ পিছন দিকে তাকান, বঁশী? পারলাম না, কিছু ভেই পারলাম না।—কথা কটা বলেই অটহাস্য করে ওঠে এবং ছুটে অদৃশ হয় পাগলটা।



পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে ওরা। সমস্ত চেতনা যেন মুহূর্তে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ পরে ওরা সবিৎ ফিরে পায়।

আয় সময়, ওদিক থেকে বঁশীর আওয়াজটা আসছে।—স্থজিত সময়ের হাত ধরে টানে।

দক্ষিণ দিকে ক্রান্ত পদক্ষেপে এগোয় ওরা। বঁশীটা একটানা সুরে বাজতে থাকে। সুর মুহূর্তেই বন্ধ হতে থাকে দুই সাহসী মন।

একটু তাড়াতাড়ি চল।—বলেই স্থজিত আরো ক্রান্ত হাঁটতে থাকে। ওরা অনেকক্ষণ হাঁটে। কিন্তু বংশী বাদকের আর সন্ধান পায় না।

হঠাৎ সামনে তাকিয়ে দেখে সামনে জল। চলা কি শেষ হয়ে গেছে?

দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনে ওরা। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে বঁশীটা যেন উত্তর দিক থেকে বাজছে।

আওয়াজ লক্ষ্য করে হাটতে থাকে ওরা। কিন্তু উত্তর প্রান্তে উপস্থিত হয়ে শোনে দক্ষিণ প্রান্ত থেকে বাঁশীর আওয়াজ ভেসে আসছে।
থামতে চেষ্টা করে ওরা। কিন্তু এক অজুত সম্মোহনী শক্তি ওদের টেনে নিয়ে যায়।

দক্ষিণ দিকে উল্লাদের মত ছুটতে থাকে ওরা। চোখের সামনে পৃথিবী যেন ঘুরতে থাকে।

পায়ে কি যেন একটা আটকে যেতেই স্থজিত বালুর উপর আছড়ে পড়ে চেঁচিয়ে ওঠে, সমর! সমর!—জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে।

একই অবস্থা সময়ের। সেও বালুর ওপর আছন্নের মত পড়ে যায়।
স্বপ্নের মত একটা দৃশ্য ভেসে উঠে স্থজিতের চোখের সামনে।

চন্দ্রালোকিত রাত্রি। একটা ছোট পানসী নৌকা হেলে ছলে যাচ্ছে নদীর উপর দিয়ে। নৌকায় বসে নব পরিণীতা বর বধু।
বর বাঁশী বাজায়, বধু কান পেতে শোনে। মিষ্টি স্বরে মুগ্ধ হয়ে যায় সে।

মাকি নৌকা বেয়ে চলে আর মাঝে মাঝে তাকায় লোলুপ দৃষ্টিতে বধুর শরীরের গহনাগুলোর দিকে। নৌকা একটা চরার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। মাকি আন্তে আন্তে উঠে পড়ে। নিঃশব্দে ছইয়ের ভিতর ঢুকে একটা চক্চকে ছোরা বের করে আনে। স্থজিত অক্ষুণ্ট স্বরে বলে ওঠে, খুনী—খুনী!

একবার চাঁদের আলোর ঝিকমিক করে ওঠে ছোরাটা। তারপর আমূল বসে যায় বরের বুকে। নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লাগি মেয়ে জলে কেলে দেয় মাকি।

হঠাৎ দূরে দেখা দেয় পাগলা। তীরের মত ছুটে এসে ঝাপিয়ে পড়ে সাঁতার কাটতে থাকে নৌকা লক্ষ্য করে।

মাকি দ্রুত নৌকা বেয়ে চলে স্রোতের অহুঙ্কে। মুহূর্ত মধ্যে নৌকা বহুদূরে গিয়ে পড়ে। দূর থেকে শুধু শোনা যায় নববধুর করুণ বিলাপ ধ্বনি।

স্থজিত চেঁচিয়ে ওঠে, ধর, খুনীকে ধর।

ধীরে ধীরে স্থজিতের জ্ঞান ফিরে আসে। পূর্বাকাশে তখন সূর্যদেব সবে উৎকি দিয়েছেন। উঠে বসে চমকে ওঠে স্থজিত। পায়ের কাছে একটা কঙ্কাল। হাতে একটা বাঁশের বাঁশী।

বাঁশীটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয় জলে।

ছপাৎ! একটা শব্দ হয়।

নিঃসর মরাতের সেই করুণ বংশীধ্বনি আর কোনদিন শোনা যায়নি।

[লিখেছেন : সমীরকুমার চক্রবর্তী]

সেই দুর্গন্ধ

আট বছর লক্ষ্যে কলেজে শিক্ষকতা করার পর যখন নৈনীতালে বিড়লা কলেজে শিক্ষকতা করার আহ্বান পেলাম, তখন খুবই আনন্দ হলো। আনন্দ হবার দুটি কারণ—প্রথমতঃ, হেড অব দি ডিপার্টমেন্টের পোষ্ট। বেতন বেশ কিছু বেশী। দ্বিতীয়তঃ, নৈনীতাল পাহাড়ী জায়গা, যার প্রতি আমার ছোটবেলা থেকেই টান। আহ্বানের সাদা দিতেই চাকরিতে যোগদানের নিমন্ত্রণ পত্র পেলাম। ১৯৭১ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম দিনই নতুন কাজে যোগ দিলাম। বেশ ক'মাস হৈ হৈ করে দিনগুলো কাটছিল।

একদিন বিকেলে আমার এক সহকর্মী প্রফেসর পাণ্ডে আমার বাড়ী এলেন। রেসিডেনসিয়াল পাবলিক স্কুল হওয়ার ফলে, কলেজের সব অধ্যাপকদের বাড়ী কলেজ প্রাঙ্গণের মধ্যেই অবস্থিত। তাই নিজেদের মধ্যে রোজই যাতায়াত ছিল। সহকর্মী হলেও আমরা সবাই প্রফেসর পাণ্ডেকে শ্রদ্ধা করতাম, কারণ তিনি বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক বড় ছিলেন আর চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের মাত্র বছরখানেক বাকী ছিল। যাহোক, প্রফেসর পাণ্ডে একথা সে-কথা বলার পর আজ জিজ্ঞেস করলেন, চারিয়া (আমার অববড় পদবী ভট্টাচারিয়ার শর্ট কর্ন দাঁড়িয়েছিল 'চারি'), তুমি নাকি প্রায়ই তোমার মিসেসকে নিয়ে নাইট শোভে সিনেমা দেখে রাত একটা দেড়টার বাড়ী ফেরা?

হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

দেখো চারিয়া, তুমি নতুন লোক। তোমার এতো রাত্রে স্ত্রীকে নিয়ে বেড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

সে তো বুঝলাম, কিন্তু আপনি বারণ করছেন কেন?

কিছুক্ষণ ইতস্তত করার পর প্রফেসর পাণ্ডে যা বললেন তার সারমর্ম ঠাণ্ডাল এই যে, আমাদের এই পাহাড়ী অপদেবতাদের আড্ডা।

সেই দুর্গন্ধ

বহুলোক প্রাণ হারিয়েছে অপধাতে, রাত ন'টার পর তাই আর কেউ বাড়ীর বাইরে বেরোয় না।....

প্রফেসর পাণ্ডে চলে যাবার পর আমি আর আমার স্ত্রী সীমা খুব খানিকটা হাসলাম—ওর ভূতের ওপর বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্পর্কে আলোচনা করে। আমি যে খুব একটা সাহসী লোক তাম, কিন্তু ভূত-প্রেতে কোনো কালেই বিশ্বাস নেই আমার। সীমা কনভেন্টে পড়া মেয়ে, শহরে বড় হয়েছে, তাই ওরও ভূত-প্রেতে বিশ্বাস নেই। সুতরাং স্বভাবতই, প্রফেসর পাণ্ডের কথা আমরা কেউই গায়ে মাখলাম না।

পরদিন সকালে কলেজে গিয়ে আমার এক বন্ধু প্রফেসর রানাকে প্রফেসর পাণ্ডের রূপা কথাগুলো বললাম। রানা আমার বয়েসী, প্রায় তিরিশের কোঠায় বয়স, নৈনীতালেই তার জন্ম। সব শুনে বললেন, আমাকে প্রফেসর পাণ্ডে যা বললেন তা না বললেই ভালো হতো। অকারণে ভূত-প্রেতের কথা বলে কাউকে ভয় পাইয়ে দেবার ব্যাপারটা সে মোটেই পছন্দ করে না। রানা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু দু'তিনজন ছাত্র এসে পড়াতে আর বাকী কথা হলো না। তবে একটা জিনিস বুঝতে পারলাম। রানা নিজেও ভূত-প্রেত সম্পর্কিত কথাগুলো বিশ্বাস করেন।

কলেজ থেকে বাড়ী ফিরে সীমাকে রানার কথাটা বললাম। সীমা হেসেই উড়িয়ে দিল। কিন্তু রানার কথাটা আমার মনে বেশ কিছুটা সংশয়ের উদ্রেক করল। ভয়-টয় পাইনি, তবে, এখানকার মাহুষের ভূত-প্রেতে বিশ্বাসের কারণটা জানার জন্যই তীব্র কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

তিন-চার দিন পরের ঘটনা। রাত তখন প্রায় বারোটা। আমি আমার ঠাণ্ডিকমে বসে মাসিক পরীক্ষার খাতা দেখছিলাম। পরদিন সকালে মার্কশীট জমা করতে হবে। গোটা পঁচিশ খাতা বাকী ছিল। ঠিক করেছিলাম রাত একটা নাগাদ খাতা দেখার পাট চুকিয়ে তারপর শোবো। সীমা পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছিল।

আমার ঠাডিক্রমে একটা কাচের জানালা আছে। তারই পাশে আমার টেবিল। টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছিল আর আমি যতো শীগগির পারি খাতা দেখা পর্ব শেষ করার চেষ্টায় ছিলাম। ডয়ার খুলে সিগারেট বের করে যখন লাইটার জ্বাললাম, হঠাৎ জানালার দিকে চোখ পড়ল আর মনে হলো যেন একটা কুসিত মুখ জানালার পাশ দিয়ে সরে গেল।



ডেসিং গাউনটা গায়েই ছিল। টর্চ নিয়ে বৈঠকখানাতে এসে দরজা খুলে বাড়ীর পেছনের দিকটার পেলাম, কারণ আমার ঠাডিক্রমটা বাড়ীর ভেতর দিকে। www.banglabookpdf.blogspot.com জোরালো টর্চের আলো ফেললাম চারিদিকে। ঘন কালো জঙ্গল আর হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা হওয়া ছাড়া কিছুই পেলাম না।

কিছুক্ষণ টর্চটা নিভিয়েই দাঁড়িয়ে রইলাম। ভাবলাম, যদি কেউ ভয় দেখাবার কিকিরেই এসে থাকে। কারণ কলেজের প্রায় সকলেই জানে যে এই বাঙালী প্রকেশের জুত-প্রোতে একবারেই বিশ্বাস করে না।

কিন্তু একটানা বেশ কিছুক্ষণ অন্ধকারে ভুতের মতো দাঁড়িয়ে থেকও

আসল বা নকল ভুতের দেখা পেলাম না।

কিরব বলে যেই 'টর্চ' ছেলেছি অমনি একটা তীব্র পচা গন্ধ নাকে এলো। www.banglabookpdf.blogspot.com

ওরকম বিস্মী গন্ধ আমি জীবনে আর কখনো পাইনি। গন্ধটা ক্রমশ তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু রুমাল না থাকায় আমি নাকে কিছুই চাপা দিতে পারলাম না।

নিশ্বাস বন্ধ করে বেশীক্ষণ থাকা যায় না, তবুও নিশ্বাস চেপে টর্চের আলো এদিক-ওদিক ফেললাম কিন্তু তেমন কিছুই চোখে পড়ল না। দম ফেলে যেই আবার শ্বাস নিয়েছি অমনি সমস্ত গা গুলিয়ে উঠলো পচা গন্ধে। কোনো রকমে বাতী ফিরে এসে গরম জলে মুখটা সাবান দিয়ে ভালো করে ধুলাম।

সিগারেটটা নিতে গিয়েছিল। সেটা ধরিয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়লাম। কিছুই দেখা গেল না—অন্ধকার ছাড়া।

টেবিলের সামনে বসলাম। বাকী খাতাগুলো দেখব বলে যেই লাল কলমটা তুলেছি অমনি আবার সেই বিস্মী, পচা গন্ধ নাকে এলো।

তখন টেবিল-ল্যাম্প নিভিয়ে দিয়ে ঘরের বড় আলোটা জ্বাললাম।—গন্ধ আর পেলাম না। ভাবলাম বাইরে কোনো জন্তু-জানোয়ার মরে পচেছে আর তারই বিকট পচা গন্ধ আসছে। আবার টেবিল ল্যাম্প ছেলে কাজে মনোযোগ দিলাম। কিন্তু প্রায় মিনিট তিনেক পর আবার সেই বিচিত্র গন্ধ নাকে এলো। এবার আর বড় আলোটা জ্বাললাম না। বরং টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিলাম। ঘর অন্ধকার হয়ে যাবার সাথে সাথে পচা গন্ধ আরো তীব্র হয়ে উঠলো। অসহ্য গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে আবার টেবিল ল্যাম্প জ্বাললাম। বড় আলো জ্বাললাম। কিন্তু গন্ধ আর যেতে চায় না। উঠে বেড়ক্রমে এলাম।

সীমাকে জাগলাম। ও তীব্র ঘুমকাভুরে। আমার কথার বিশেষ কর্পণাত করল না। সিরিয়াসলি বোঝাবার চেষ্টা করলাম ওকে। জিজ্ঞেস করলাম, কোনো ছগন্ধ নাকে ওর ঢুকছে কিনা। ও বলল, কই, না তো!

আশ্চর্য ব্যাপার। আমি একই ঘরের একই বিছানায় বসে গন্ধটা

পাছি আর সীমা পাচ্ছে না—এও কি সন্তব!

নাকে ভোয়ালে জড়িয়ে আমি বসে রইলাম। সীমা উঠে গিয়ে ঠাড়িকন্মের ছোট্ট আলোই নিভিয়ে এলো। কিন্তু কোনো রকম গন্ধই ও পেলো না। আমাকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে খানিকক্ষণ ঠাট্টা করল ও। তারপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি শোবো কি, গন্ধের চোটে তোয়ালে সরতেই পারছি না নাক থেকে। অনেকক্ষণ একইভাবে বসেছিলাম। তারপর কখন যে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই।

সকালে সীমার ডাকে হুম ভাঙল। ওর হাতে চায়ের পেয়ালা।

পরদিন সকালে কলেজে গিয়ে আমার বন্ধু রানাকে রাতের ঘটনা সব বললাম। অনেক কথা জানা গেল ওর কাছ থেকে। খুবই আশ্চর্য হলাম।

রানা বলল, এই কলেজে হেড অব দি ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের পদে গত কয়েক বছর ধরে কোনো ভদ্রলোককেই রাখা যায়নি। গত চার বছরের মধ্যে আমি অষ্টম ব্যক্তি। এর আগে সাতজন ছিল। তারা সকলেই উচ্চশিক্ষিত ছিল। বারো শো টাকা মাইনে এবং ফ্রী বাংলা দিয়েও কাউকে কলেজ কর্তৃপক্ষ ধরে রাখতে পারেনি। এসবের পিছনে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে। চার বছর আগে প্রক্‌সর রঙ্গনাথ একটি মেধাবী ছাত্রের ওপর অকারণে রাগ করেন এবং তাকে ইংলিশে ফেল করিয়ে দেন। এই ছাত্রটি পাহাড় থেকে লাক্ষিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে এবং তার আটদিন পরে প্রক্‌সর রঙ্গনাথ হাট্ট আট্টাকে মারা বান। তারপর প্রক্‌সর সিং, ডক্টর শর্মা, শ্রী বাসু, প্রক্‌সর ঘোষী, ডক্টর রাও, প্রক্‌সর শিবদাসনী ও প্রক্‌সর চোপড়া এই পদে কাজ করেন। কিন্তু কেউই এখানে চার পাঁচ মাসের বেশী টিকতে পারেননি। সবাইকেই ওই একই ছাত্রের অশান্ত আত্মা ভর দেখিয়ে বা কোনোরকম অনিষ্ট করে তাড়িয়েছে।

কলেজ থেকে কিরে বাড়ী এসে সীমাকে কিছুই বললাম না। একটা ব্যাপার আমার মাথায় আসছিল না—প্রক্‌সর রঙ্গনাথের মৃত্যু কেন হয়েছিল? আর একটি প্রশ্ন। প্রক্‌সর রঙ্গনাথের উপর ছাত্রটির

আক্রোশের না হয় কারণ বোঝা গেলো, কিন্তু অত সব প্রক্‌সরদের উপর তার রাগের কারণ কি?

অনেক ভাবলাম। কিন্তু প্রশ্নটার সহজত্তর পেলাম না।

তিন-চার দিন পরের ঘটনা। কলেজের একটা কাংশান দেখে রাত দশটা নাগাদ সীমাকে নিয়ে ফেরত আসছিলাম। খুব শীত ছিল, তাই আমরা ভাড়াভাড়ি পা চালিয়ে পাহাড় থেকে নামছিলাম। জমিট অন্ধকার। আশপাশের জঙ্গল থেকে কত রকমের জানোয়ারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। বোঝা হয় স্কন্ধপক্ষ ছিল, কারণ আকাশে চাঁদ বা তারা কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। পরিবেশ ভয়াবহ মনে হচ্ছিল। কিন্তু বাসা কাছে বলে খুব একটা ভয় করছিল না। টর্চ আলিয়েই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম আমাদের সামনে, প্রায় দশ গজ দূরে, কলেজের পোশাক পরা একটা ছেলে হেঁটে যাচ্ছে।

পেছন থেকে ভালো করে টর্চ ফেলে দেখলাম ক্যানলের পরম প্যান্ট ও নেভী ব্লু রেক্সার পরনে। মনে হলো মাথাতে একটা মাফলার জড়ানো। এতো রাত্রে কলেজের ছেলে এদিকে কোথায় যাচ্ছে ভেবে আমি বেশ চিন্তিত হলাম। কারণ যে রাস্তা দিয়ে আমরা নামছিলাম সেটা আমার বাংলার পাশ দিয়ে সোজা বাইরে নেমে গেছে। রাত্রে কোনো ছাত্রকেই শহরে যাওয়ার অমুমতি দেয়া হয় না। রেসিডেন-সিয়াল কলেজে সব ছাত্রই হোষ্টেলে থাকে। এসব ভেবে আমি ইংরেজীতে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কে যাচ্ছে?

কিন্তু কোনোই উত্তর পেলাম না।

এদিকে সীমা ধমকে উঠল। বলল, কই, কেউ তো কোথাও নেই, কাকে দেখে তুমি এমন চেঁচাছ?

বুঝলাম, আমি ছাত্রটিকে দেখতে পলেও সীমা তাকে দেখতে পাচ্ছে না। সীমাকে চুপ করে থাকতে বলে আমি ছাত্রটির উদ্দেশ্যে সেই একই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলাম।

গোটা ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্যজনক। কি অবাক কাণ্ড! এই জমিট অন্ধকারে ছেলেটি নিবিচারে বিনা টর্চের আলোতে তরতর করে হেঁটে এই আঁকাবাঁকা পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে নেমে যাচ্ছে। দ্বিতীয়বারও

কোনো উত্তর না পেয়ে আমি ধমকের সুরে বললাম, ঠে, হয়্যার ইউ আর ঠ সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি মুখ কেঁরাল। কী ভয়ঙ্কর! অমন বীভৎস, কুৎসিত মুখ আমার জীবনে এর আগে কখনো দেখিনি। ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। বিকট একটা শব্দ করে চেতনা হারিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম সোখান্নেই।

আজও মনে পড়ে তার কুৎসিত মুখখানা। নাকের জায়গাতে এক বিরাট গর্ত, ঠোঁট ছোট নীচের দিকে বুলে পড়েছে। চোখের মণির জায়গায় ছোট গর্ত আর সারা মুখে ক্ষতের অসংখ্য চিহ্ন। সে এক বীভৎস চেহারা—মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে আজও।

জ্ঞান কিরতে দেখলাম আমার বেড়রুমে একদল লোকের ভিড়। প্রিলিপাল, দশ-বারো জন সহকর্মী, কলেজের ডাক্তার গঙ্গোলা আর সীমা। সীমার চোখ-মুখ দেখে মনে হলো, খুব কঁদেছে।

সর্বপ্রথম প্রিলিপাল প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছিল?

বিছানা থেকে উঠে বসতে চেষ্টা করতে গিয়ে বৃত্তে পারলাম, সর্বশরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। কপালে হাত দিয়ে দেখলাম ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সকলেরই মুখ গম্ভীর ও চিন্তিত।

আমি ইচ্ছে করেই সমস্ত ব্যাপারটা একেবারে চেপে গেলাম। কেবল এটুকু বললাম যে, পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবার আগে বিকট চীৎকার করেছিলাম। এই কথাটা ওরা সম্ভবত সীমার কাছে শুনেছিলেন, তাই মনে হলো আমার কথা শুনে ওরা কেউই সম্ভত হননি। যাই হোক, একে একে সবাই একসময় চলে গেলেন।

এরপর সীমাকে সব ব্যাপারটা শোনালাম। সীমা এক কথায় বলল, চাকরি ছেড়ে পাও। চলো, আমরা লক্ষ্যে চলে যাই।

কিন্তু আমি বললাম, তা হয় না। এর একটা কিছু বিহিত করতেই হবে। আমি চলে গেলে আমার জায়গায় যে আসবে তারও তো এই একই অবস্থা হবে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, সীমা কিছুই দেখতে পায়নি। আমি চেঁচিয়ে পড়ে যেতেই ও হতভম্ব হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর কঁদে ফেলে। একই পরে নিজেই সামলে নিয়ে আমার হাত

থেকে খসে পড়া টর্টে। তুলে নিয়ে ছুটেতে ছুটেতে কলেজে গিয়ে একটি ছাত্রকে সমস্ত ঘটনা বলে। সেই ছাত্রই সকলকে খবর দেয়। তারপর কলেজের দারোগান, পিওন ও শিক্ষকগণ ধরাধরি করে আমাকে বাসায় নিয়ে আসে।

দিন কাটতে লাগল। আট-দশদিনের মধ্যেই আমি চাকরা হয়ে উঠলাম এবং কলেজে যোগ দিলাম। ইতিমধ্যে প্রায় সব ছাত্রই একবার করে এসে আমার খবরাখবর নিয়ে গিয়েছিল। কাজে যোগদানের পর সকলেরই এক প্রশ্ন, সেদিন আসলে কি হয়েছিল? পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম। এই একই উত্তর আমি দিয়েছি আবার সকলকে।

কলেজের সহকর্মীদের সহধর্মীরা সীমাকে নানারকম পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন যেন রাতে বেরোবার আগে আমার কপালে বিভূতি লাগিয়ে দেওয়া হয়। সাইবাবার বিভূতি, নীম করোলাবাবার বিভূতি এবং আরো কত বাবার বিভূতি। দেখলাম ভূতের ভয় আমার যতো নয় তার চেয়ে বেশী সীমার। যাহোক, বিভূতির ব্যাপারে ওকে ঠাট্টা করলে ওর সেক্টমেটে আঘাত লাগবে ভেবে আমি ওকে কিছুই বলিনি। এবং যথারীতি সকলের আগে বেরোতে হলে, বিভূতি লাগিয়েই বেরোতাম।

ছোটবেলা থেকে একটা বিশ্বাস ছিল যে ভূত-প্রেতরা মানুষের শরীর ছুঁতে পারে না। ভূতের গল্প কম শুনিনি, বিশ্বাস করিনি কিন্তু কখনো। আমার দৃঢ় ধারণা ছিল যে, ভূতরা যখন মানুষকে ছুঁতে পারে না তখন ভয়ের কিছু নেই, ওরা আমার অনিষ্ট কিছু করতে পারবে না কোনদিন। কিন্তু সেদিনকার অভিজ্ঞতার ফলে বুঝলাম যে শরীর না স্পর্শ করেও অপদেবতারা অনিষ্ট করতে পারে, এমন কি, ভয় দেখিয়ে মানুষের প্রাণও কেড়ে নিতে পারে।

বলতে দ্বিধা নেই, সেদিনকার ঘটনার পর থেকেই আমি ভূত বিশ্বাস করতে শুরু করি। ফলে খুবই ভীত হয়ে পড়ি আমি। কিন্তু নিজের এই দুর্বলতাটা প্রকাশ করতে আমি একেবারেই অনিচ্ছুক ছিলাম। তাই কলেজে কাউকে আসল ঘটনার কথা বলিনি। সীমার সামনে কপালে বিভূতি ভাজিল্যের সাথে লাগাতাম বটে, তবে মনে মনে নিজেই

অনেকটা নিরাপদ মনে করতাম।

ভয় পেয়েছিলাম তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আরো ব্যাপার ছিল। ভূতের একটা কিনারা করতে হবে এবং বাঙালীরা যে সাহসী তার একটা প্রমাণ এই অবাঙালীদের দিতে হবে—এই রকম একটা জেদ আমাকে পেয়ে বসেছিল।

মাস দুই কেটে গেল। কোন রকম ভূতের বা বলতে পারেন সেই ছাত্রটির অশান্ত আত্মাটির কোনোরকম অত্যাচার বা উপদ্রব হয়নি।

জুন মাসে নৈনীতালে টুরিস্টদের খুব আনাগোনা হয়। আমরাও একদিন শহরে বেড়াতে গেলাম। বেলা তিনটেতে রওনা হয়েছিলাম, ঠিক করেছিলাম সন্ধ্যার আগে অতি অবশ্যই বাড়ী ফিরে আসব।

কিন্তু শহরে আমার এক বন্ধু বিজয়ের সাথে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। লক্ষ্যের ছেলে, ইউনিভার্সিটিতে চার বছর এক সাথে কাটিয়েছি। লক্ষ্যের প্রচণ্ড গরম ও লু থেকে বাঁচার জন্ত নৈনীতালে বেড়াতে এসেছে। প্রথমেই অভিযোগ করলাম আমার বাসার না উঠার জন্ত। বাহোক, একথা সে কথার পর রাতের খাওয়া ওর হোটলেই স্থির হলো। সন্ধ্যার আগে আর কেহা হলো না। কিরবো কিরবো করতে করতে সেই রাত নয়টা বেজে গেলো।

পাহাড়ে যখন উঠতে শুরু করলাম তখন রাত সাড়ে নয়টা। রাত করে বাড়ী ফিরি—মনটা অজানা আতঙ্কে দুন্দু দুন্দু উঠছিল। অবশ্য সীমা সঙ্গে ছিল এবং ওকে খুবই উৎসুক দেখাচ্ছিল।

আমার সময় বিজয়ের টচ'টা চেয়ে নিয়ে এসেছিলাম। বাড়ীর কাছাকাছি অবধি যখন এসে পড়লাম তখন ভয় অনেকটা দূর হলো। বাড়ীর সদর দরবার তালো খুলে একটা স্বস্তি লাগ করে বৈঠকখানার আলোর সুইচ অফ করলাম।

কিন্তু আলো জ্বলল না। তার বদলে একটা রিটর্ট পৈশাচিক হাসির শব্দ শুনতে পেলাম। যেন অন্ধকারে ঠিক গামার সামনে দাঁড়িয়ে এক প্রোতাল্লা বিকট শব্দ করে হাসছে। আর সেই সাথে—ভীত পচা গন্ধে আমার সারা শরীর গুলিয়ে উঠতে লাগলো।

সীমা আতঙ্কিত করে আমাকে জড়িয়ে ধরল। ওকে সামলাতে

সেই হৃগন্ধ

গিয়ে ঘটল আর এক বিপদ। আমার হাত থেকে টচ'টা কাপে'টের উপর পড়ে গেলো।

ভগবানকে স্মরণ করে সেই বীভৎস হাসি আর অসহনীয় পচা হৃগন্ধকে অগ্রাহ করে আমি কোটের পকেট থেকে লাইটারটা বের করলাম। কিন্তু তিন-চারবার ক্লিক ক্লিক স্পার্ক দেওয়া ছাড়া লাইটারটা আর কোনো কাজ দেখাতে পারল না। ধীরে ধীরে সীমার হাত শিথিল হতে লাগল। আমাকে ছেড়ে দিচ্ছিল ও। বুঝতে পারছিলাম, সীমা জ্ঞান হারাচ্ছে। পকেটে লাইটার রেখে সীমাকে ধরে সামলাতে যাবো এমন সময় আবার সেই বিকট অট্টহাসি ঠিক আমার কানে এলো। চমকে উঠে যা করবার তাই করলাম, সীমাকে ছেড়ে দিলাম।

পড়ে গেল সীমা। আর সাথে সাথে সেই পিশাচ যেন বিগুণ উৎসাহে হা হা করে হাসতে লাগল। হাসির চেয়ে অসহ্য ছিল পচা হৃগন্ধ। বৈঠকখানায় যেন কেউ অসহ্য বৃতদেহ ফেলে রেখে গেছে।

বিজ্ঞান নেই কিনা নিঃসন্দেহ হবার জন্ত সীমাকে ফেলে রেখেই হাতড়ে হাতড়ে বেড়কমে ঢুকলাম, যথারীতি সুইচ অন করলাম কিন্তু আলো জ্বলল না। এবং ঠিক সেই সময় আবার আমার কানের কাছে মুখ এনে বজ্রকণ্ঠে হাসতে আরম্ভ করল। আমি আর সন্ত করতে না পেয়ে নিজের অজ্ঞাতেই চে'চিয়ে উঠলাম, 'কর গডস লেক, গেট আউট ফ্রম হিয়ার! আই হ্যাভ নট ডান ইউ এনি হার্ম!'

আমার সেই চে'চানিতে যেন আমি নিজেই সখি ও সাহস কিরে পেলাম। এবং আশ্চর্য্য হাসিটা অকস্মাৎ থেমে গেলো। আমি কোনো রকমে হাতড়ে হাতড়ে বিছানার উপর থেকে টচ'টা নিয়ে ছালাম।

হাসি থেমে গিয়েছিল আগেই, এবং টচ'টা জ্বলতেই ভীত পচা গন্ধটাও কপূ'রের মতো উবে গেলো। কিন্তু বিপদ কাটল না।

এবার নতুন ঘটনা, নতুন উপদ্রব। সারা বেডরুম কান্নার আওয়াজে ভরে উঠল। কাতর কব্বণ স্বরে কে যেন অবিরাম কাঁদছে।

এ-ঘরে কান্নার আওয়াজ, ও-ঘরে সীমা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। আমি যে কি করব ভেবে উঠতে পারছিলাম না। কারণ কান্নার আওয়াজটা ঠিক রান্নাঘরের দরজার সাংসনে দিয়ে আসছিল। এবং আমাকে বেড

কম থেকে রান্নাঘরে গিয়ে মোমবাতি জ্বালিয়ে তবে বৈঠকখানা থেকে সীমাকে তুলে আনতে হবে। যাহোক, কোনোরকমে টিচ' নিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে মোমবাতি জ্বলে বৈঠকখানাতে এলাম। কিন্তু মোমবাতিটা টিপয়ের ওপর রেখে যেই সীমাকে পাঁজাকোলা করে তুলেছি বেড়কমে আমার জন্তু অমনি কে যেন হু' দিয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল।

আবার সেই নিশ্চিহ্ন অন্ধকার। যাহোক, সীমাকে যেই বিছানাতে শুইয়ে দিয়েছি ঠিক সেই সময় আলো জ্বলে উঠল।

বৈঠকখানার আর বেড়কমের সুইচ অন থাকার কলে সব আলো জ্বলে উঠল আর সাথে সাথে সেই কাতর কান্নার আওয়াজ খেমে গেলো। আমারও যেন ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো। সাহস, শক্তি, মনোবল সব যেন নতুন করে ফিরে পেলাম।

সীমার মুখে ঠাণ্ডা জল ছিটানাম, কিছুক্ষণ পরও চোখ খুলল। ভয়ের চাউনি, বুঝলাম অত্যধিক ভয় পেয়েছে। একটু ভ্রান্তি খাইয়ে দিয়ে ওর গায়ে ভালো করে লেপ চাপা দিলাম। আমি সারা রাত ওর মাথার কাছে বাড়ীর সব ক'টা আলো জ্বলে দিয়ে বসে রইলাম।

পরদিন সীমা অনেক দেবী করে ঘুম থেকে উঠল। শরীর সুস্থ ও স্বাভাবিক। কথাবার্তা শুনে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। কলেজে যাওয়ার পথে আমার এক সহকর্মীর জ্বরী কাছে ওকে রেখে গেলাম।

সেদিনই সেই আত্মহত্যাকারী ছাত্রটির নাম এবং সে কোন সালে এই কলেজে পড়তো তা জেনে নিয়ে কলেজের অফিস রেকর্ড' বো'টে তার ঠিকানা বার করে তার বাবাকে সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে একটি চিঠি লিখলাম। দশ দিন পর তার কাকার চিঠিতে জানলাম যে তার বাবা বছর চারেক আগে মারা গেছেন। যাহোক, চারদিন ছুটি নিয়ে আমি সীমাকে সঙ্গে করে লক্ষ্মী রওয়ানা হলাম। সীমাকে লক্ষ্মীতে পশুরালয়ে রেখে আমি সোজা গয়ায় চলে গেলাম। সেখানে ছেলেটির নামে পিণ্ডদান করে, লক্ষ্মী থেকে সীমাকে নিয়ে পুনরায় নৈনীতালে ফিরে এসে কাজে যোগদান করলাম।

আজ প্রায় ছ'বছর হতে চলল, কিন্তু পিণ্ডদানের পর আমরা কেউ আর কোনো রকম ভয় পাইনি। হাসির আওয়াজ, সেই পচা দুর্গন্ধ, কাতর কান্নার শব্দ বা রাতে কলেজের পোশাকে ওকে দেখা—কোনো-

টাই আর কখনো ঘটেনি।

সীমা যেদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় এবং আমার চেঁচানির কলে বিকট অট্টহাসি কাতর কান্নায় পরিবর্তিত হয়, সেদিনই আমার মনে প্রপঞ্চ উদয় হয় যে, ছেলেটি মারা যাবার পরে তার বাবা-মা কি করেছিলেন? তাই তার বাবাকে আমি চিঠি লিখি।

ছেলেটির কাকার চিঠিতে জানতে পারি যে ছেলেটি পাহাড় থেকে লাক দিয়ে আত্মহত্যা করার কলে তার শরীর প্রায় ছুই হাজার ফুট নীচের খাদে গিয়ে আটকে যায়। সোজা খাদে গিয়ে পড়েনি, বহু পাথরের ওপর ঠোকর খেয়ে, ধাক্কা খেয়ে তবে খাদে পড়েছিল। শরীরের সবটুকু অংশ নীচে অবধি নামেনি। কিছুটা মাত্র অংশ খাদে পড়েছিল। তার বাবা এবং মা বহু চেষ্টা করেও, টাকা খরচ করেও সবটুকু শরীরের অংশ সংগ্রহ করতে পারেননি। তাই তারা কৈদে কৈদে কেবরত চলে গিয়েছিলেন এবং শব দাহ করাও সম্ভব হয়নি।

চিঠি পাবার পর আমি সেই জায়গাটিতে গিয়েছিলাম, ছেলেটি যেখান থেকে লাক মেরেছিল। কোনখানে যে তার শরীরের কিছু অংশ পড়েছিল সেটাও পাহাড়ের হুড়া থেকে আন্দাজ করেছিলাম আমি এবং সেখান থেকে যে তার শরীরের অংশটুকু সংগ্রহ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল তাও বুঝতে পেরেছিলাম। সে রাতে ছেলেটির আত্মার কাতর কান্নার আওয়াজে আমি বড়ই দুঃখ পেয়েছিলাম। ওর কান্নার আওয়াজ শুনে আমার কেন যেন মনে হয়েছিল, ও কোনো সাহায্য চায়, তাই অমন করে কৈদে চলেছে। আমি ওর আত্মাকে শান্তি দেওয়ার জন্তু তাই গয়াতে গিয়ে পিণ্ডদান করি। এই ঘটনার পর থেকে কতবার তো গভীর রাতে শহর থেকে বাসার ফিরেছি কিন্তু কোনোরকম ভয় পাইনি।

নৈনীতালে আজও আমি চাকুরি করছি আর সমস্ত ঘটনাটা যে সত্যি তা পাঠকেরা কেউ নৈনীতালে বেড়াতে এলে বিভূলা বিজ্ঞানদিয়ে এসে যে কোনো প্রক্সেসর বা পুরাতন কর্মচারীর কাছ থেকে ঘটনাটার প্রমাণ পেতে পারেন।

[লিখেছেন : বাসুদেব ভট্টাচার্য]

কাটা হাত

কথাগুলো হজ্বিল আমার বন্ধু জাকির আহমদের বাসায়। জাকির আহমদ এখন অবসর প্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট। বয়সে প্রবীণ। একজন দায়িত্বশীল নাগরিক অথচ তার মুখ দিয়ে এ ধরনের অবিবাস্য কাহিনী শুনে হবে, আমরা কেউ ভাবতে পারিনি। বৈঠকে আমি ছাড়া আমাদের আরো দু'জন বন্ধু ছিলেন। তাদের একজন অবসর প্রাপ্ত সাবজজ, আর একজন ব্যবসায়ী।

সময়—শীতকালীন এক সন্ধ্যা। স্থান—ছোট এক মধ্যম শহর; যে শহরে আমরা সবাই হঠাৎ করে একত্রিত হয়েছিলাম এবং এই একত্রিত হবার একমাত্র কারণ জাকির। তার সাথে দেখা হওয়ায় সে নিজেই আমাদের তার বাসায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। আর বহুদিন পর এতোগুলো পুরনো বন্ধুকে একত্রে পাবার আশায় আমরা সবাই মোটামুটি নির্দিষ্ট সময়ে জাকিরের বাসায় হাজির হয়েছিলাম।

প্রাসঙ্গিক, অপ্রাসঙ্গিক বিভিন্ন আলোচনার পর একসময় জাকির তার জীবনের বহুবিধ বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয় থেকে খুলে বলেছিল কাহিনীটা। ভুল বললাম, কাহিনী নয়—সত্যি ঘটনা। আর এই অবিবাস্য ব্যাপারটা প্রথমে আমাদের সবাইকে এমন হতচকিত করে দিয়েছিল যে আমরা প্রতিবাদ করার মতো শক্তিও হারিয়ে ফেলেছিলাম। প্রসঙ্গত এখানে বলে নেওয়া ভালো যে আলোচনাটা অতিপ্রাকৃত মোট নিয়েছিল এবং সে সময় সে স্থানের আবহাওয়া ও পরিবেশও ছিল অস্বাভাবিক।

সকাল থেকে ঝির ঝির করে বৃষ্টি। সন্ধ্যা পর্যন্ত। কোনো বিরতি নেই। তার ওপর রেডিওতে খবর তিন নম্বর সতর্ক সঙ্কেত। শো শো করে একটানা বোঝা হওয়া—ক্রমেই বাতাসের বেগ বাড়ছে। এর ওপর হঠাৎ করে ইলেকট্রিসিটি অফ হয়ে যাওয়ায় মোমবাতির স্বর অস্থির আলোর আমরা চারজন এক অস্বস্তিকর পরিবেশে বসে ছিলাম।

জাকির ঘটনাটা শেষ করার পর অনেকক্ষণ আমাদের কোনো বাক্যকুতি

কাটা হাত

১৭

ঘটেনি। তবে খানিক পরে আমাদের সাবজজ বন্ধুটি সরাসরি বলে উঠলেন—আমি বিশ্বাস করি না। মানুষের কাটা হাত যে প্রতিশোধ নিতে পারে, এই প্রথম শুনলাম। উত্তরে জাকির বলল—আমিও তো প্রথমটায় বিশ্বাস করিনি। কিন্তু স্থানীয় সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর করে এছাড়া অল্প কিছু ভাবা যায় না।

ব্যবসায়ী বন্ধুটি প্রথম থেকেই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। সে ব্যাপারটা চাপা দিতে চায়—থাকগে, এসব আলাপ বাদ দাও!

এবার আমি মুখর হই—বাদ দাও বললেই কি বাদ দেয়া যায়? এমন গাজাখুরি ঘটনা বলে আমাদের ঝাক দেবে, আর আমরা মেনে নেবো?

জাকির অন্তোপায় হয়ে উত্তরে বলে—বিশ্বাস না করলে আমার বক্তব্য নেই। কিন্তু ঘটনাটা সত্যি এ কথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

—তা জানি না। তবে আমি নিজে তদন্ত করে যা দেখেছি তাই বললাম। এতোটুকু অতিরঞ্জিত করিনি। সে বিশ্বাস রাখতে পারো। জাকিরের কণ্ঠস্বর অকপট।

—অতি-প্রাকৃত অংশটুকু বাদ দিয়ে কোনো রকমে স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবে এটাকে দাঁড় করানো যায় না?—প্রশ্ন করি।

—ব্যাখ্যা একটাই হতে পারে। সেই হাতের মালিক হয়তো জীবিতই ছিল। কোনো সুযোগে ফিরে এসে আলফাজকে গলা টিপে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করেছিল। কিন্তু এ ব্যাখ্যা ধোপে টিকবে না। বিশেষ করে মৃতদেহ পরীক্ষা করার পর ডাক্তার যে মন্তব্য করেন তাতে তিনি স্পষ্টই বলেছেন, মনে হয় কোনো কঁকালের হাত তার গলায় পাঁচটা ছিদ্র করে দিয়েছে। তাছাড়া আলফাজের দাঁড়ের কাঁকে আটকে থাকা ভজ্জী, আঙ্গুলের ছোটো হাড় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এখন এর কি ব্যাখ্যা করতে হবে। এক দমে এতোগুলো কথা বলে নিয়ে জাকির একটা সিগারেট ধরায়। আমরা প্রত্যেকে হতভম্ব হয়ে সমস্ত ঘটনাটা আবার চিন্তা করতে থাকি।

সংক্ষেপে জাকিরের বিবৃত ঘটনাটা নিয়ন্ত্রণ:

আমি তখন আসামের জুরখাল সার্কলের সি.ও.। ছোট থান; শহর। অধিকাংশই স্থানীয় অধিবাসী। বিদেশী বলতে আমি, থানার ও. সি., ডেইন ডাক্তার—মাত্র এই তিন ব্যক্তি আর কয়েকজন ভোজ-

পুরী পুলিশ কনেষ্টবল। এখানে আসার পর এই এলাকার পাহাড়ীদের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য আমার নজরে পড়ে তা হলো, এদের মধ্যে দলগত হানাহানি ও বংশগত প্রতিহিংসাপরায়ণতা। এই প্রতিহিংসার শিকার হয়ে প্রায়ই সম্ভাচ্ছে ছ'চারটে হত্যাকাণ্ড ঘটতে। বুদ্ধ, শিশু বা স্ত্রীলোক সবকিছু কোনো বাদবিচার নেই। সুযোগ পেলেই এক পক্ষ প্রতিপক্ষের ছ'একজন সদস্যকে নৃশংসভাবে হত্যা করে তার লাশ পথে ফেলে রাখতে। কলে সমগ্র এলাকার প্রায় সব সমরই একটা অস্থির উত্তেজনা বিরাজমান ছিল।

এর মধ্যে শহরের একপ্রান্তে এক ছয়ছাড়া প্রোট পাজাবী এসে ডেরা বাঁধল কাঠের এক বাংলোয়। সঙ্গে তার এক পাহাড়ী চাকর ছাড়া আর কেউ নেই।

পাজাবী ভক্তলোক বিপত্নীক, অতিমাত্রায় ঘরভুণে। শহরে কোনো সময়ই বের হন না, শুধু চাকরই তাঁর বাজার-হাট করে নিয়ে যায়। শিকারই ভক্তলোকের একমাত্র শখ। মাঝে মাঝে বন্দুক হাতে ঘর থেকে বের হয়ে ছুগুন পাহাড়ী অফলে একা একা শিকার করতে চলে যান।

ঘীরে ঘীরে শোনা গেল—তাঁর নাম আলকাজ খান। বাড়ী পাজাবে। এখানে এক চা-বাগানের মালিকের কাছ থেকে বাংলাটা কিনে নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে ডেরা বেঁধেছেন। এ শহরে সবাইকে তিনি বর্জন করে চলেন এবং নিজেও চান না কেউ তাঁর এলাকার অনধিকার প্রবেশ করুক।

যা হোক, লোকমুখে জোর প্রচারণা চলতে থাকে ভক্তলোক একজন দাগী আসামী। মানুষ খুন করে তিনি এখানে আত্মগোপন করেছেন।

আলকাজ খান আমাদেরও আলোচনার খোরাক হয়ে উঠলেন। আমি, ও. সি. সাহেব ও ডাক্তার যখনই একত্রে মিলিত হতাম তখনই এই লোকটি আমাদের আলোচনার একমাত্র বিষয়বস্তু হয়ে উঠতেন। তার গতিবিধির খোঁজখবর করার জন্য আমরা গোপনে লোক লাগিয়েও সন্দেহজনক কোনো কিছু আবিষ্কার করতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত তিনজন মিলে একত্রে তার সাথে একদিন দেখা করব বলে স্থির করলাম।

এবং গেলামও একদিন আমরা তার বাংলোয়।

আলকাজ খান তখন বাংলোর সামনে খোলা চত্বরে বসে বাইকেল পড়িষ্কার করছিলেন। হঠাৎ আমাদেরকে প্রবেশ করতে দেখে প্রথমতায় নিম্মিত হলেও স্বাভাবিক সৌজন্যবোধে আপ্যায়ন জানালেন। ভাঙা ভাঙা উচ্চ বাংলায় মিশ্রিত ভাষায় অনূর্গল আলাপ করে গেলেন আমাদের সাথে। এরই এক ক'কে চাকরকে ডেকে চা-নাস্তার করমায়েশ করলেন। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আলকাজ খান সম্বন্ধে আমাদের যে কিরূপ ধারণা ছিল, তা অনেকাংশে দূরীভূত হলো।

আসলে ভক্তলোক দিলখোলা লোক। কিন্তু বাইরে কোথাও না যাবার কলে এবং কারো সাথে না মেশার কলে তার সম্পর্কে একটা বিরূপ ধারণা গড়ে উঠেছিল।

কথা প্রসঙ্গে আরো জানা গেলো উনি একজন সাহসী শিকারী এবং এই শিকার উপলক্ষে হিমালয়ের তরায়, কুমায়ুন, সন্দরবন ও আসামের বহু জঙ্গলে ঘুরেছেন। প্রথম জীবন কেটেছে আফ্রিকায়। সেখানে শ্রমিক সরবরাহের ঠিকাদারী করতেন। সেই উপলক্ষে আফ্রিকার জঙ্গলে, মরুভূমিতে জীবন হাতে নিয়ে ঘুরতে হয়েছে তাকে। হিংস্র জীবজন্তুর হাত থেকে নিজের সাহসের কল্যাণে বহুবার প্রাণ রক্ষা করতে পেরেছেন। এবং এই বেঁচে থাকার তাড়নাই তাকে সাহসী এক শিকারীতে রূপান্তরিত করেছিল এক সময়।

জীবনে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেছেন, ব্যয়ও করেছেন তাল মিলিয়ে। বছর দশেক আগে জী মারা যাবার পর আফ্রিকা ছেড়ে দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু কোথাও মন টিকেনি। তাই ঘুরে ফিরে এক সময় আসামের এই থানা শহরটাকে বেছে নিয়েছেন শেষ জীবনের আশ্রয়স্থল হিসেবে।

ভালো মতো চা-নাস্তা শেষ করে তাকে পান্টা আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা ফিরে এলাম এক সময়।

মাস দুয়েকের মধ্যে আলকাজ খানের সঙ্গে আরো বার কয় যোগাযোগ হয়েছিল। ইতিমধ্যে একদিন আমরা সবাই মিলে শিকারেও গিয়েছিলাম।

প্রকৃতপক্ষে আলকাজ খানের সাথে এর মধ্যেই আমার বেশ আন্তরিকতা গড়ে উঠেছিল। একদিন বেশ অন্তরঙ্গ পরিবেশে আমার সাথে

আলকাজ খানের কথাবার্তা হচ্ছিল। এসঙ্গ—শিকার।

কথার কথায় আমি ভিজেস করলাম—আচ্ছা খান সাহেব, আপনি তো বহু জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেছেন। আপনার অভিজ্ঞতাও প্রচুর। এর মধ্যে নিশ্চয়ই বিশেষ ধরনের অ্যাডভেঞ্চারের ঘটনা আপনার মনে আছে?

—বহু রকম অ্যাডভেঞ্চারই তো আমার জীবনে আছে।—খান সাহেব জবাব দিলেন।

—সিংহ, বাঘ, বাইসন, ভালুক, গরিল। ইত্যাদি জন্তুর মধ্যে কোনটিকে আপনি সবচেয়ে বেশী হিংস্র বলে মনে করেন?

—সবই সাধারণতঃ এক। তবে আমি সবচেয়ে হিংস্র বলে মনে করি যে জন্তুকে তার নাম হলো মাহুঘ।

—মাহুঘ?

—হ্যাঁ। মাঝে মাঝে আমাকে মাহুঘও শিকার করতে হতো।

কথা বলতে বলতে সেদিন তিনি আমাকে তার ভেতরের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রপাতি দেখাতে থাকেন। বিভিন্ন দেশের তৈরী রাইফেল ও রিভলবার সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে থাকেন। তার ভিতরের ঘরটি যেন একটি অস্ত্রশালা। ঘরের চারিদিকে কালো সিল্কের পর্দা ঝোলানো এবং সেই বহুমূল্য পর্দার উপরে সোনার কারুকর্ম খচিত চিত্রকলা শোভা পাচ্ছিল। এর মাঝে সবচেয়ে বিস্ময়কর যে বস্তুটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হলো মাহুঘের বিচ্ছিন্ন একটি হাতের থাবা। হাতের মাঝামাঝি থেকে মনে হয় এক কোপে কাটা। বিড়ক মাংস জড়ান, একটি হাতের থাবা। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার কাটা হাতটাকে মোটা লোহার শিকল দিয়ে দেয়ালের সাথে আটকে রাখা হয়েছে—যেন জীবন্ত কোনো কিছুকে সাবধানে বেঁধে রাখা হয়েছে।

আমি আলকাজ খানকে ভিজেস না করে পারলাম না—এই কাটা হাতটা এভাবে বেঁধে রাখার কি অর্থ? এটা কি এখান থেকে পালিয়ে যাবে?

—পালিয়ে যাওয়াটা বিচিত্র কিছু না।—হাসতে হাসতে আলকাজ খান বললেন।

—বলেন কি!

—সত্যি কথাই বলছি।

—হাতটা কার?

—আমার এক জন্মশত্রুর। লোকটা আফ্রিকার এক নিগ্রো কুলীর সর্দার। হাতটার আকার দেখেই বুঝতে পারছেন নিশ্চয় লোকটা কী প্রকাণ্ড, কী বিশালকার ছিল!

—তা বুঝতে পারছি। কিন্তু ব্যাপারটা কি বলুন তো?

—ব্যাপার আর কি! টাকা-পয়সা নিয়ে ভারী রামেলা করতো। কথার কথায় ভয় দেখাতো, কুলীদের ভাগিয়ে নিয়ে যাবো। জানেন, ওর জন্তে কয়েকটা কাজে আমাকে লোকসান দিতে হয়। শেষ পর্যন্ত আর সহ করতে না পেরে একদিন ওর সাথে ধ্বংসযুদ্ধে নামি।

—তারপর?

—তারপর এক সুযোগে তরবারীর এক কোপে ওর ডান হাতটা একে-বারে নামিয়ে দিয়েছিলাম। ওহ, সে কি রক্ত! যেন একটা আন্ত মোষ জবাই করে দেয়া হয়েছে। কাটা হাতটা মাটিতে পড়ে লাফালাফি করল কিছুক্ষণ।

—সর্দারের কি হলো?

—একটা হাত হারিয়েও লোকটার দেমাক কমেনি। সেই অবস্থায় বাঁ হাতে কাটা ডান হাতটা ধরে, সে আমাকে দেখে নেবে বলে চ্যালেঞ্জ করে বিদায় নিয়েছিল। আমি অবশ্য হেসেই ওর কথাটা উড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু.....।

—কিন্তু কি?

—না, তেমন কিছু না। মজার ব্যাপার কি জানেন? লোকটা আবার বড় জাতের গুণীন ছিল। থাকগে ওসব কথা, চলুন ও-ঘরে গিয়ে বস। যাক। ড্রিংকসে বসে আলকাজ খানের সাথে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে চান্সা খেয়ে এক সময় বিদায় নিলাম।

পরে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে এ বিষয়ে আলাপ করতেই ওরা কাটা হাতটা সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে ওঠে। ওরা আমাকে চেপে ধরল। ওদেরকে সাথে করে নিয়ে যেতে হবে।

আমার রাগী না হবার কোনো কারণ ছিল না। ঠিক হলো, একদিন

সময় করে সবাইকে নিয়ে সেই কাটা হাতটা দেখে আসব।

কিন্তু আমাদের সে আশা আর পূরণ হয়নি।

দিন পনের পরের কথা। হঠাৎ করে আলকাজ খানের মৃত্যু সংবাদ পেলাম। খবরটা চমকে ওঠার মতো। আমরা তিনজনই আলকাজ খানের বাংলায় গেলাম। সমস্ত বাংলাটা ঘুমথমে। পাহাড়ী চাকরটা করুণ মুখে সিঁড়ির গোড়ায় বসে ছিল। আমাদের দেখে সে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল শোবার ঘরে। শোবার ঘরেই আলকাজ খানের মৃতদেহ পড়ে ছিল।

আমাকাপড় ছিন্নতন্ন, চুল উকোথুকো। বোঝা যায় মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আততায়ীর সাথে লড়েছেন। চোখ দুটো আতঙ্কে বিক্ষারিত। সটান পড়ে আছেন মেঝেতে। গলার নলিতে পাঁচ জায়গায় গভীর ছিদ্র, রক্ত সেখানে জমাট বেঁধে গেছে। ভক্তির ভালোভাবে পরীক্ষা করে মন্তব্য করলেন—স্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে এবং যে গতগুলো গলায় দেখা যাচ্ছে সেগুলো মনে হয় কোনো হাড়িসার কবালের হাতের। কথাটা শোনার সাথে সাথে আমার দৃষ্টি দেয়ালে শিকলের সাথে আটকানো সেই শুকনো হাতের খাবাটার উপর গিয়ে পড়ল। আশ্চর্য! সেখানে খাবাটা নেই। শিকলটা ছিন্ন অবস্থায় ঝুলছে দেওয়ালে। খাবাটা কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেছে।

আলকাজ খানের মৃতদেহ ভালোভাবে পরীক্ষার পর আরো একটা উল্লেখযোগ্য জিনিস পাওয়া গেল। জিনিসটা পাওয়া গেল—মৃত ব্যক্তির দাঁতের কণ্ঠে আটকানো। সেটা হলো, সেই হাতের খাবার তক্তনীর আঙুলের দুটো পর্ব। আলকাজ বামও কম শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন না। মারা যাওয়ার আগে তিনি দাঁত দিয়ে আঙুলটা কেটে নিয়েছিলেন। সমস্ত ঘটনাটা চিন্তা করে আমার সর্বশরীর ভরে যেন হিম হয়ে গেল। তাহলে সমস্ত ব্যাপারটা কি অতি-প্রাকৃত?

আলকাজ খানের চাকরটার জবানবন্দী নেবার সময় আরো তথ্য জানা গেল। জানা গেল যে ইদানীং প্রতি রাতে তার মনিব শোবার ঘরে যেন কার সাথে তুমুল ঝগড়া করতেন। অথচ সারা বাংলায় সে ও তার মনিব ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো প্রাণী নেই। আরো

একটা কথা সে নতুন শোনাল। সেটা খুবই বিস্ময়কর! ব্যাপারটা হলো, প্রতিদিন তার মনিব চাবুক দিয়ে ওই কাটা হাতটাকে ক্ষুদ্র আক্রোশে ক্লান্ত না হয়ে পড়া পর্যন্ত পিটিয়ে যেতেন। এ ছাড়া ইদানীং তিনি যেন কোন গুপ্তশক্তির ভয়ে সদা-মতর্ক থাকতেন এবং সবসময় আত্মরক্ষার অস্ত্র সঙ্গে রাখতেন।

আমাদের বন্ধু ও. সি. সাহেব খুবই বাস্তববাদী লোক। তিনি অতি-প্রাকৃতের ব্যাপারটা কোনোক্রমেই বিশ্বাস করতে চাননি। যতো রকমের সম্ভব, তদন্ত করেও কেসটার কোনো সুরাহা করতে না পেরে এক সময় হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেন।

কয়েকদিন ধরে আমিও বিভিন্ন স্তর ধরে চিন্তা-ভাবনা করে আলকাজ খানের মৃত্যুর হৃদিশ বের করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। সবকিছু মেলাতে পারলেও আলকাজ খানের গলায় পাঁচটা চিহ্ন, দাঁতের ভিতর থেকে সেই কাটা তক্তনীর অংশ এবং শিকল ছেঁড়া সেই অদৃশ্য হাত আর খাবার রহস্যের কোনো সমাধান করতে পারিনি। চিন্তা করতে গিয়ে পরপর কয়েকটা রাত ধরে হৃৎস্পন্দ দেখলাম। দেখলাম সেই কাটা খাবাটাকে। সেটা যেন আমার সারা ঘরে কাকড়া বিছের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মেকের দেয়ালে, পদার উপরে, টেবিলে, বিছানায় ওটা যেন হৃৎস্পন্দের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ভয় পেয়ে চমকে উঠে আলো খেলে দেখি—কোথাও কিছুই নেই।

সবটাই হৃৎস্পন্দ মাত্র।

এর মাঝে আর একটা ঘটনা ঘটল।

আলকাজ খানের কবর দেখতে গিয়ে হঠাৎ একদিন হতচকিত হয়ে গেলাম। সেই কাটা হাতটা কবরের পাশে পড়ে আছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, সেই হাতের তক্তনীর প্রথম দুটা ঝুণ্ড নেই।

এরপর আর আমার কোনো সন্দেহ রইল না যে, ব্যাপারটা প্রকৃত পক্ষে অতি-প্রাকৃত।

[লিখেছেন : এহসান চৌধুরী]

অভিশপ্ত শৃঙ্খল

কথা শুনে শুনে এক বিচিত্র অনুভূতি জেগে উঠেছে। একটা কিছু নিদারুণ ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে, ঝাঁচ করতে পারছি।

আকাশ ভরা ছোয়াংরা। চতুর্দিকে গাছগাছালি, জঙ্গল, ঝোপঝাড়। আলো-অঁধারির মধ্যে দিয়ে ছুটে আসছে মনমোতি।

হাওয়ায় ঘাগড়া ছলছে, দুরছে। মাথার ওড়নাটাও উড়ছে। মনমোতি দেউলের কাছাকাছি আসছে যতো, ছোট্টার বেগটাও বাড়িয়ে দিচ্ছে ততো।

আকাশ-ছোঁয়া দেউল।

হাঁপাতে হাঁপাতে দেউলে প্রবেশ করল মনমোতি। প্রবেশের মুখে হেঁচট খেলো। পড়ে বাজিল, কোনোমতে সামলে নিলো নিজেকে।

কাবার ছুটে আসছে আর একজন। রজনীচন্দ্র। ওর পরনের দুটিটা মালকোঁচা বাঁধা। শক্ত সমর্থ ঘোয়ান। নিকষ কালো রঙ হলেও পাথর গোদাই চেহারা। গায়ে একটা কতুরার মতো জামা।

আসছিল একটু বাঁকা পথ ধরে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে, গাছের ছায়া মাজিয়ে। মুখের চেহারা দেখেই বোঝা যায়, আতঙ্কিত। অজানা নয়, জানা কেউ যদি দেখে ফেলে, আর রকে নেই।

নিজের জন্তে ভাবনা করে না রজনী। ভাবনা তার মনমোতিকে নিয়ে। রজনীচন্দ্র মরুক, জুগুৎ নেই। কিন্তু মনমোতির মান সন্ত্রম খোয়া যাক তার কারণে, তা সে চায় না। আসতে চায় না সে, কতবার বলেছে, তুমি কেন আসতে বলো নিতি? তুমি কি এটা বোঝো না, কত ভয়ানক তোমাতে আমাতে?।

হামি তবুও টকাং হামি না। তুমি না এলে, আমার মৃত্যু! কেন মাসি, তুমি কি জানো না? কেন ডাকি, তুমি কি বোঝো না?

মনমোতির ছলছলে চোখের দিকে ডাকিয়ে ছপ করে থাকে রজনীচন্দ্র।

রজনীচন্দ্রকে বলে মনমোতি, আমার এ বন্দীদশা, আমার এ নির্ধাতন অসহ হয়ে উঠছে। তুমি আমার মুক্তি দিতে পারো না?

রজনীচন্দ্রের চাপা নিঃশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে বাতাসে।

আগে আসত মনমোতি। উপরে উঠে, এই সোনালিকুরী ধীপ থেকে মুনরবনের অনেক জায়গা দেখত চোখ মেলে। নজরে পড়েছে দূরে রজনীচন্দ্রকে। হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। ধারে কাছে কেউ নেই। নির্ভরে এসে।

রজনীচন্দ্র এসেছে।

দেউলে প্রবেশ করেছে। ভিতরের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে উপরে উঠে গেছে একদম—শেষ ছুড়ার চাতালে যেখানে দাঁড়িয়ে মনমোতি।

মনমোতির এ জায়গার অকস্মিক সব নশদপণে। তিন পুরুষ ধরে এসে বাস করছে রাজস্থান থেকে। বেশভূষা আচার ব্যবহার সবই বজায় আছে দেশের।

সীমাকান্তর ঠাকুরদাও দেশ ছেড়ে এসেছে মনমোতির ঠাকুরদার সাথে। ওরা ছুঁজন পরস্পরের অন্তর বন্ধ। দেশছাড়া হলেও নিজেদের বিরোধের সংস্কার টিকই বজায় রেখেছে। নিজেদের জাত-বৈদ্যদের মধ্যে যুক্ত নিপুণ ছুঁয়া সেনাদের আরো দক্ষ করে তোলার জন্য আসা ওয়ের। ক্ষত্রিয়রাজা আনিয়ছেন বললেই চলে। সেই থেকে জায়গীর পেয়ে খানদানী রাজপুত্র বংশের প্রতিষ্ঠা এখানে।

এই প্রতিষ্ঠা, এই বনেদী বংশের কুল মর্যাদা ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে মনমোতি। সীমাকান্তর কান্না কণা উঠল। ছুঁ একজনের চোখে পড়েছে নাকি মনমোতির গোপন অভিসার। ওরাই বিশ্ব টেলেছে।

শোনার পর বস্ত্রপাতের পক্ষে চমকে ওঠার মতো চমকেছে সীমাকান্ত। বিশ্বাস করে নিতে বিধা এসেছে। সীমাকান্তর দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তি চিড় খেতে একটু দেরী লেগেছে।

সীমাকান্ত নিজেকে চেনে। যাচ্ছে তাই মানুষ। এই নিয়ে ষিটমিটি লেগেই আছে ছুঁজনের মধ্যে। মনমোতি বহুবার বলেছে—তুমি বংশের মুখে চুনকালি মাখাছ! দিনরাত থাক বারমহলে! কেছায় কান পাতা দায়। গোখের সাগনে দিয়ে কোনো মেয়ে ফাবার উপায় নেই। স্ত্রী

হয়ে স্বামীর নিন্দে কাহাতক শোনা যায়? সময় সময় মনে হয় ঐশ্বর্য
গেলে বাঁচি।

স্বামীর ওপর এতো দরদ যে জ্বর, যে জ্বর এতো সম্মান জ্ঞান—
সে কলঙ্কিনী?

অন্তরঙ্গম বলেছে, বিশ্বাস না হয় নাই করলে, লক্ষ্য রাখতে তো
আপত্তি নেই?

লক্ষ্য রাখে সীমাকান্ত।

সীমাকান্ত যখন তখন ভেতর মহলে এসে হাজির হয়। শোবার
ঘরে গিয়ে হানা দেয়। না পেলে হস্তে হয়ে খুঁজে বেড়ায়। দেখেও মনে
মনমোতি ভাবে জটার দেউলে জটাবাবার মানত সকল হয়েছে তার।
ঘটা করে পূজা দিতে হবে চৈত্রসংক্রান্তির দিনে। মানতি পূরণ করতে
হবে। বাইরে থেকে ঘরে মন কিরেছে মালিকের। নজর পড়ছে তার
ওপর। www.banglabookpdf.blogspot.com

সীমাকান্তর সন্দেহবাতিক দিনকতক ছিল মাত্র, তারপর উবে যায়
কপূরের মতো। হিংস্রকে মানুষবা যা তা রটায়। শ্রেক গাভরাহ।
হবে না কেন। এমন রূপ এ তল্লাটে একটি মেয়েরও তো নেই।

আবার আগের প্রবৃত্তি জেগে উঠল সীমাকান্তের—নেশাখোরা।
বারমহল সরগরম হয়ে উঠল।

মনমোতি মনমরা হয়ে পড়ল। এ লোকের ঘরে মন বসানো ছুঃসাধ্য।
বীতম্প্রহ হয়ে পড়ল নিজের ওপর। এমনই জী সে, কোঁতে পারল না
স্বামীকে। অদ্ভুতের বিচার। একা ঘরে নিজের কপাল চাপড়েছে নিজে
নিজেই। উচ্ছ্বসের বুজা গল্পের এগিয়ে যাচ্ছে মানুষটা। চোখে দেখা
যায় না। নীরব অসহায় দশকের ভূমিকায় বসে তাই দেখবে শুধু
মনমোতি? মনমোতির মতো মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয় তা। এবর ছেড়ে,
এদেশ ছেড়ে চলে যাবে সে। যেখানে মন যায়, সেখানে গোপনে
চিঠি পাঠাল রজনীচন্দ্রের কাছে। রজনীচন্দ্র বাবার খুব প্রিয় পাত্র।
এই জোয়ানটাই সেনাদের মধ্যে সেনাপতি হওয়ার যোগ্য। বাবার
কাছে সে এলেই, মনমোতিকে দেখিয়ে, বহুবীর ভূনিয়েছে বাবা।

রজনীচন্দ্রের শক্তির কোনো দস্ত নেই। দেখলে মনে হয় মাটির

মাহুষ। সরলতার প্রতিচ্ছবি মুখ জুড়ে। ঠোঁটে হাসি লেগেই আছে
সদাসর্বদা। বাবার মতে, ওর মতো বিশ্বাসী বীরপুরুষ লাখোতে একজনও
আছে কিনা সন্দেহ।

বাবার মেহপুট বলেই সাহসে ভর করে একদিন বলেই ফেলেছে
রজনীচন্দ্র নিজের মনের কথা। একান্তে বসে রাজস্থানের ইতিহাসের
পাতায় চোখ বুলাচ্ছে বাবা। পশ্চিমীকে আয়নার দেখে পাগল আলা-
উদ্দীন। শেষে ভরহরত পালন করে আগুনে আত্মহত্যা দিয়ে আলা-
উদ্দীনের লালসার আগুনের ছোঁয়া থেকে মুক্তি পেয়েছে পশ্চিমী।

ঘরে এসে মাথা নীচ করে দাঁড়াল রজনীচন্দ্র। বইয়ের পাতা থেকে
মুখ তুলে তাকাল বাবা। রজনী, এমন করে দাঁড়িয়ে কেন? কিছু কি
বলবি?

মনের কথা বলেছে রজনীচন্দ্র।

শুনে, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছে বাবা কিছুক্ষণ।

তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলেছে, আমি পরে জানাব
তোকে। www.banglabookpdf.blogspot.com

মাকে বলতেই মা ক্বেপে আগুন। ভিনজাতের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে?
ভীমরতি আর কাকে বলে!

যদিও বা বছর ছই দেবী হতো আরো মনমোতির বিয়ে হতে, এসব
শোনার পর মা সময়টা এগিয়ে নিয়ে এলো। পৌষ কেটে যেতেই
মাঘের প্রথমে বিয়ে। তলে তলে ব্যবস্থা করে কেলল মা।

সীমাকান্তর সঙ্গে বিয়ে।

বাবা মাধার হাত বলিয়ে দিয়েছে রজনীচন্দ্রের। বলেছে, মনমোতি
সুখী হলে, তুইও নিশ্চয় সুখী হবি, কেনম তাই না?

রজনীচন্দ্র মুখে বলেনি হ'। ঘাড় নেড়ে জানিয়েছে, সুখী হব।

মনমোতি মনপ্রাণ দিয়ে পছন্দ করত রজনীচন্দ্রকে। ওর বিমর্ষ মুখে
হাসি দেখে, ভেতরটা ডু করে কেঁদে উঠেছে। কামা চেপে হেসে বলেছে,
তোমার বিয়ের নেমন্তন্ন করতে ভুলো না যেন। উত্তর কি পাবে, না
পাবে না, শোনার অপেক্ষা না করে বেরিয়ে গেছে ঘর থেকে।

মুমদাম করে কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে বিয়ে হয়ে গেলো।

সকাল যায়, সন্ধ্যা যায়, দিন যায়, রাস যায়। ঘুরে এলো একটা বছর। আরো একটা, আরো একটা—তিন বছর কেটেছে। স্বামী-সোহাগিনী হতে পারেনি মনমোতি। চেষ্টার ক্রটি ছিল না, 'ভাগ্য কলতি সর্ধত্র'।

বিবাহল কয়েদখানা মনে হয়েছে। মনমোতি দম আটকানো পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে চায়।

মনমোতির চিঠি পেয়ে হুঁচোখ সজল হয়ে উঠেছে রজনীচন্দ্রের। নেউলে দেখা করতে বলেছে। পভীর রাতে যাবে সে।

কোপকাড়ের পেছনে আত্মগোপন করে চলতে চলতে দেবেছে রজনীচন্দ্র। দেউলের শেষ ছুড়ার চব্বরে দাঁড়িয়ে মনমোতি। হাতের ইশারায় ডাকছে রজনীচন্দ্রকে।

রজনীচন্দ্রকে কাছে পেয়ে চোখের জল কথতে পারেনি মনমোতি—বালির বাধ ভেঙ্গে যেন বন্য়ার জলের স্রোত ছুটেছে হুঁচোখ থেকে।

খানিক কাঁদার পর ধরা গলায় বলেছে, আমার জীবন বিষমর হয়ে উঠেছে। তুমিই একমাত্র বাঁচাতে পারো আমাকে।

কেন পালাতে চাইছে মনমোতি—সীমাকান্তর ইতিহাস শুনে সব জানা হয়ে গেছে রজনীচন্দ্রের। বুকটা মোচড় দিয়ে উঠেছে। সাসুনা দেবার জন্ত বলেছে, শাস্ত হও। উত্তলা হয়ো না। অন্ধকার চিরকাল থাকে না মানুষের জীবনে। আলো আসে। তোমারও আসবে। বডো পালানি পালানি ভাববে, ততো মন উড়ু উড়ু হয়ে উঠবে। মনের কোণে স্থান দেবে না ওসব চিন্তা।

মনমোতি বলেছে, ঘরে টিকতে পারি না আমি। তুমি একবার করে এসো এখানে। অন্তত একবার করে দেখা করো।

প্রতি রাতে আসে রজনীচন্দ্র। আশ্বাসের বাণী শোনায়। তোমার মনোবাহা পূর্ণ হবে নিশ্চয়। সীমাকান্তর সংস্কৃতি জেগে উঠবে নিশ্চয়।

মনমোতি বলে, তোমার কথা কলছে না রজনী। আর প্রবোধবাধ্য নাই বা শোনালে। তুমি কি চাঁও, লোকটা চোখের সামনে মল্লক, আর

তার অসহায় সাক্ষী হয়ে থাকবো আমি? আমি পারবো না।

আজ্ঞা আর ক'টা দিন—ভারপর ব্যবস্থা করা যাবে। ক'টা দিন, ক'টা দিন করে দীর্ঘ দিন কাটিয়ে দিতে চেয়েছে রজনীচন্দ্র। সময়ের সাথে সাথে মানুষের মনেরও পরিবর্তন হয় অনেক সময়। নিজের জল বুকে নিজেকে সংশোধনও করে নিতে পারে সীমাকান্ত একদিন। জীবন মনের বেদনা বৃদ্ধিতে পারবে। কিছুই বিচিত্র নয় এ জগতে! ল্যচটনও ঘটে যায় হঠাৎ—এটা তো মিথ্যে নয়। কে বলতে পারে, মনমোতি স্থখী হবে না? মনমোতির ভেতরের দশান্ত ডেউ স্থির হয়ে যাবে না?

কেটে গেলো আরো মাসখানেক।

কিছুই হলো না। সীমাকান্ত সেই আগের মতোই, কোনো পরিবর্তন নেই। মনমোতির পালানোর ইচ্ছেও মন থেকে পালানো না। নিজের ব্যথার কাভারনি নিজ জন্ততে জন্ততে পাগল হয়ে উঠলো। মনমোতি বলল রজনীচন্দ্রকে, আরো কি সময় নিতে চাও তুমি?.....

মনমোতির এটাই শেষ কথা। ওই দেউলেই ধরা পড়ে গেছে হুঁজনে। গুপ্তচররা দেউলে নিয়ে এসেছে সীমাকান্তকে লুকিয়ে। লুকিয়ে রেখেছে ওকে জটাঝাড়ের মূর্তির পেছনে। বলেছে ওকে, তোমার ধারণা ভুল। মনমোতি তোমার জন্ত রাতিতে শিবশস্ত্রর কাছে প্রার্থনা করতে আসে না। আসে অভিসারে। দেখতেই পাবে স্বচক্ষে।

সীমাকান্ত দেখেছে। এলো মনমোতি। শিবের কাছে প্রার্থনার নামগন্ধ নেই। সটান ওপরে চলে গেল। একটু পরই নেমে এলো তরতর করে। রজনীচন্দ্র এসেছে। সাথে করে নিয়ে গেলো ওপরে।

মাথায় খুন চেপেছে সীমাকান্তর।

চুপিসারে কাজ সেরে কেলতে হবে।

রজনীচন্দ্রের গুম খুন বাইরের বাতাস পর্যন্ত টের পাবে না।.....

এই অবধি বলে, স্থানীয় ছেলটি দেউলের দিকে তাকিয়ে হুপ করে রইল। এতোক্ষণ ও দেউল-কাহিনী শোনাচ্ছিল আমাদের।

এই ছেলটাই ওপার থেকে নৌকা করে এপারে নিয়ে এসেছে

আমাদের। ছেলেরি বলতে কিশোর নয়, তরুণ। ঠোঁটের ওপরে সফ্র
গোঁকের রেখা। হাঁটুর ওপরে মালকোঁচা বেধে কাপড় পড়া। কোমরে
লাল গামছা। পাকিয়ে বাঁধা। খালি গা, মাথায় কঁকড়া ছল।

যা বলল এতোকণ ধরে—সেই দৃশ্য ভাসছে যেন এখনো চোখের
সামনে!

আর ছ'জন শক্ত সমর্থ চেহারার যুবক—যারা আমার মতোই কৌতূহলী
মন নিয়ে একই নৌকায় এসেছে দেখতে—তাদের মুখ-চোখ দেখে মনে
হলো, ছেলেরি কোনো কথায় বিশ্বাস করেনি ওরা।

ওদের ছ'জনের মধ্যে মাথায় একটু বেশী উঁচু যে যুবক, মুচকি হেসে
বলল, মধু গিলেছিস বেশী বুরি? তোর ব্যাপারখানা কি বলতো?
ভেবেছিস কি?

এসব জাবোল-তাবোল বললে পয়সা পাবি বেশী? বাইরের লোক
বলে ধানগাছের তক্তা দেখতে এসেছিস আমাদের?

এক বন্ধু ভৎসনা করল। অল্প বন্ধু পকেট থেকে একটা টাকা বের করে
ছুঁড়ে দিয়ে বলল, দূর হ এখন থেকে।

ছেলেটি কাচুমাচু মুখ করে বলল, ঠিকই বলেছি বাবু। এই দেউলের
কথা এখনো বাকী আছে। খাড়ির জলে শখের ধন পেঁতা রয়েছে।
চুড়োর ওপর থেকে জল অবধি বুলছে যে শেকলটা ওটা জলের তলায়
সিন্দূকে আটকানো। যার সিন্দুক সে এসে তুলবে। অল্প কেউ পারবে না।
যে কেউ হাত দিয়ে টেনেছে তোলার জন্ত, তার হাত অবশ হয়ে গেছে।

শেষে আস্তে আস্তে সারা শরীর হিম হয়ে গেছে।

যে যুবকটি টাকা ছুঁড়ে দিয়েছে, গর্জে উঠলো। তুই নিজের চোখে
দেখেছিস?

না, বাবু। লোকে বলে।

আমরা বিশ্বাস করি না। কই দেখি, ছুঁয়ে কি হয়!

দোহাই বাবু, যাযেন না! কিরে চলুন!

কাকুতি মিনতি অগ্রাহ করে যুবক ছটি নৌকায় চেপে নিজেরাই

দাঁড় বেয়ে শেকলের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো।

ছেলেটির মুখ শুকিয়ে গেলো। ভাসা ভাসা চোখে চেয়ে আছে

যেন কোন্ হৃদয়ে। দেউলের ভেতরের যে গল্প বলে গেছে একটু আগে,
আমার মনে হচ্ছে, সেই গল্পের রজনীচন্দ্র যেন ও-ই।

কেন এমন মনে হচ্ছে বুঝতে পারছি না। হয়ত নিজের পরিবেশ
বলে। হয়তো গল্পটা যুবক ছটির মনে না হোক আমার মনে দাগ কেটে
বসেছে বলে। কিংবা দিনের আলো নিভে গিয়ে সন্ধ্যা নেমেছে বলে।

যুবক ছটি শক্ত মুঠোয় শেকলটা চেপে ধরবে এবার। তারপর টেনে
তোলার চেষ্টা করবে। তোড়জোড় চলছে। হাত বারান্ধে ওরা শেকলের
দিকে। ছ'জনেরই মুখে বিজ্ঞপের হাসি ফুটে উঠেছে।

আমি অবাধ হয়ে দেখছি, ছেলেরি ওদিকে চেয়ে চেয়ে কেনন যেন
হয়ে যাচ্ছে। খুব যেন অস্থির হয়ে পড়েছে সে। দাঁড়াতে পারছে না।
বসে পড়ল। বসে থাকতেও পারল না, ছলছে। ঘাসের ওপর শুয়ে
ঘুমিয়ে পড়ল যেন। নাকি জ্ঞান হারাল, ঠিক বুঝতে পারলাম না।

আর ঠিক সেই মুহুর্তে আমি দেখতে পেলুম ঘাগরা পরা একটি অপরাধ
সুন্দরী মেয়ে যেন ছুটে আসছে। যুবক ছটি জলের ওপর নৌকা থেকে
শেকল ধরে ওপর দিকে প্রাণপণে টানছে তোলার জন্ত।

আমার মনে হলো, দেউলে যে মেয়ে প্রবেশ করল ও-ই বুরি
মনমোতি। পেছনে পেছনে রজনীচন্দ্র বুরি ছুটে আসছে। যা শুনেছি,
তারই কি প্রতিকলন এসব?

কেন জানি না, মনে হলো, গাছের পেছনে সরে গিয়ে দেখি,
আর নজরে পড়ে কিনা। নিজের হাতে চিমটি কেটে দেখলাম, ঠিকই
ব্যথা পাই। একটা হাতে ঠিকই দেখতে পাচ্ছি পাঁচটা করে আঙুল। সবই
তো স্বাভাবিক। তবে এমন দেখলুম কেন? মনমোতি রজনীচন্দ্র।

গাছের কঁাচে চোখ রেখে দেখছি আমি। একটা কিছু নিদারুণ
ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। আবার অশচি পাচ্ছি ভেতরে ভেতরে।

বাতাসের ধাক্কা লাগল আমার কানের কাছে। বেশ জোরে কে
যেন কথা করে উঠলো। আমি স্পষ্ট শুনতে পেলুম।..... রজনী. ওরা
খিরে কেলেছে আমাদেরকে। তুমি এই শেকল ধরে নেমে পালাও
এদিক দিয়ে। আমার অনুরোধ। কথা রাখো বলছি। ওপরে কে
যেন উঠছে। এসে পড়ল বলে। পায়ের শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে।

কথা ভেসে আসছে দেউলের চড়া থেকে।

আমি দেখছি, চাতালে দাঁড়িয়ে মনমোতি আর রজনীচন্দ্র।



রজনীচন্দ্র হাত নেড়ে বলছে, আমরা এখানে আসি, জেনেই যখন কলেজে কেউ না কেউ, তখন এ অবস্থার তোমাকে একা ছেড়ে পালানো!

যায় না আর। তাছাড়া, তোমার ওপর নির্ভাতন হবে দারশ, যদি আমাকে ওরা না পায়। নানান কৈকিরং দিতে হবে তোমায়। পালিয়ে যাবোই বা কেন? অন্ত্র কি করেছে আমরা? যে আসে আসুক।

আমার কথা রাখো তুমি।

তোমার কি হবে? আমি পালালে কেলেকারি। তোমার বা ভা বদনাম রটাবে ওরা। এ হতে পারে না। কেন এসেছি, কেন আমি—পরিষ্কার বলবো আমরা। এর জন্ত দায়ী সীমাকান্ত নিজে।

রজনী, তুমি যদি না যাও, এখুনি ঝাঁপিয়ে নীচে পড়ব আমি। তুমিও নিশ্চিন্ত, আমিও নিশ্চিন্ত। তোমার সামনেই শেষ হয়ে যাবো আমি।

নির্ধাক মুখে, শেকলে হাত ঠেকিয়েছে রজনীচন্দ্র। নামতে যাচ্ছে নীচে। বিদ্রোহবশে এসে পড়ল সীমাকান্ত। রজনীচন্দ্রকে আর নামতে হলো না। সীমাকান্তের ধারালো তলোয়ারের ঘায়ে, ধড় থেকে খসে পড়ল মাথা খাড়ির জলে। শেকল গড়িয়ে রক্ত নামছে নীচের দিকে। হাতের মুঠো আলগা হয়ে গেলো। রজনীচন্দ্রের দেহটা ঝপাং করে পড়ে গেলো জলে। সেই সঙ্গে মনমোতিও। মনমোতিকে আটকাতে গিয়ে সীমাকান্তও পড়েছে। গোলাপি ওড়নাটা হাতে জড়ানো।

খাড়ির জলে রক্তের ঢেউ ছিলে উঠলো। উত্তাল তরঙ্গ। শেকলটাকে ছিঁড়ে ফেলে আর কি! বাতাসে অজস্র জনের আর্দ্রনাদ বেজে উঠছে একসাথে।

আমার মাথাটা কি রকম করছে। রক্ত জমাট মিশমিশে কালো অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি আমার ছচোখের সামনে।

ভোরের আলো চোখে লাগতেই তাকিয়ে আমি অবাক। কোথায়? গাছের গুঁড়িতে মুখ গুঁজে পড়ে আছি। উঠে বসলুম। এখানে এলুম কি করে! চিন্তা করতে করতে এক এক করে দুঃস্বপ্নের দৃশ্য মনে পড়ে গেলো আমার।

আমি কি তবে স্বপ্ন দেখছি?

নৌকার দাঁড়াতেই নজরে পড়ল দেউল। নজরে পড়ল লোহার মোটা
শেকল। নৌকাটা শেকলের কাছে এখনো রয়েছে। : : : : :
গাছের পেছন থেকে বেরিয়ে এলুম আমি। ছেলেটি গালে হাত
দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। কাছে এলুম। নৌকার দিকে হাত দেখিয়ে বলল,
বারণ শুনল না। যা হওয়ার তাই হয়ে গেল বারুণ। ওনারা নেই।
বুকের ভেতর ছাৎ করে উঠলো আমার।
ছেলেটির সঙ্গে পায়ে পায়ে এগোলাম কিনারে। দেখলাম, ওদের
প্রাণহীন দেহ পড়ে রয়েছে নৌকার খোলে।

[লিখেছেন : তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী]

Join Us On Facebook

www.facebook.com/banglabookpdf

